মেঘ

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

বসু চৌধুরী
৬৭এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রীতিভাজনেষু

এই লেখকের লেখা

রূপম্ ?
একটি আশ্বাস
মণিপদ্ম
সেই উজ্জ্বল মুহূর্ত
অয়ি অবন্ধনে
জনম জনম
তুঙ্গভদ্রা
কী মায়া
আয় চাঁদ
আরও আলো
কল্কিরুবাচ
রম্যাণি বীক্ষ্য :

১. দক্ষিণ ভারত পর্ব
২. দ্রাবিড় পর্ব
৩. কালিন্দী পর্ব
৪. রাজস্থান পর্ব
৫. সৌরাষ্ট্র পর্ব
৬. মহারাষ্ট্র পর্ব
৭. উৎকল পর্ব (যন্ত্রস্থ)

ভারতবর্ষ সবে স্বাধীন হয়েছে। পাকিস্তান স্বতন্ত্র রাজ্য। তবু আমরা বিনা ছাড়পত্রে পাকিস্তানের উপর দিয়ে দার্জিলিঙে চলে এলাম।

পাহাড়ের নিচে থেকে মেঘ উঠছে। ধূসর ধোঁয়ার মতো পাণ্ডুর ঘন মেঘ। লঘু চঞ্চল অস্থির। কোথাও জমে না, কোথাও আটকায় না। নিচে থেকে উঠে এসে উপরে মিলিয়ে যায়। দেহটা এমন আলতো ভাবে ছুঁয়ে যায় যে সে স্পর্শে রোমাঞ্চ নেই। মনটা সংহত করলে শুধু শরীরে শীত সিরসির করে ওঠে।

এই মেঘ জমছে দূরের পাহাড়ে। তার রঙ বদলে গেছে। সবুজ রঙ হয়েছে ঘন নীল। তুষারমৌলি কাঞ্চনজঙ্ঘা অদৃশ্য হয়ে গেছে মেঘের আড়ালে। খানিকটা দূরের জিনিস এখন আর প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে না। সহসা আমি আমার মালবাহী কুলির সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলাম। কুয়াশায় হারিয়ে গেলে আমি আর তাকে খুঁজে পাব না।

কোথায় যাব ?

একটা হোটেলে। স্টেশনের যত কাছে হয়, তত ভাল। যত ওঠা-নামা কম, তত মঙ্গল। দার্জিলিঙে শ্রম করতে আসি নি, এসেছি বিশ্রাম নিতে। কয়েকটা দিন নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে পারলে জুতসই একটা লেখা হবে। হোটেল সবই সমান, হোটেলের শৌখিনতা আমার নেই।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে আমরা কার্ট রোড ধরে হাঁটতে লাগলাম। একটা সমর্থ পাহাড়ী মেয়ে আমার স্যুটকেস আর হোল্ডঅলটা তার পিঠে ঝুলিয়ে নিয়েছে। ফিতে দিয়ে কপালের উপর বাঁধা। বলল : গাড়ি কী হবে, হেঁটেই আপনাকে পৌঁছে দেব।

এরা তা পারে। আমি এদের পুরুষদের দেখেছি, পিঠে আলমারি

বেঁধে জলাপাহাড়ে উঠে যাচ্ছে। নেপালে মোটর বইতে দেখেছি কাঁধে করে। তিনটে পাহাড় ডিঙিয়ে কাঠমাণ্ডু। নতুন পথ তখনও খোলা হয় নি। খানিকটা পথ তাই সবাইকে হাঁটতে হত। তখন ছোট বড় মোটর নেপালীরা কাঁধে করে পার করে দিত।

হোটেলে পৌঁছে মনে হল, এখানে না এলেই পারতাম। ম্যানেজার তো নয়, যেন কাস্টম্‌সের দারোগা। তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার আর শেষ নেই।

কলকাতা থেকে আসছি শুনে ভদ্রলোক কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন। একে ছোটখাট খিটখিটে চেহারার মানুষ, তার উপর গলার আওয়াজটা ভাঙা কাঁসির মতো। তাঁর অ্যাঁ শুনে মনে হল, সেই কাঁসি বুঝি সিমেন্টের মেঝেয় পড়ে ভেঙে খানখান হয়ে গেল।

বিস্ময়ের আর শেষ নেই। বললাম: কলকাতার নামে আপনি এমন ভয় পাচ্ছেন!

ভদ্রলোক নিজেই খানিকটা প্রকৃতিস্থ হয়েছেন। বললেন: কলকাতাকে কেন ভয় পাব, ভয় পাচ্ছি আপনাকে।

আমি নিজের পা থেকে কাঁধ পর্যন্ত একবার দেখে নিলাম। ধুতির উপর গলাবন্ধ কোট, তার উপর গরম চাদর। নিজের মুখখানাও মনে মনে স্মরণ করে নিলাম—এমন কিছু বীভৎস নয় যে ভয় পেতে হবে। ব্যাকুল ভাবে আমি তাঁর পরবর্তী কথার অপেক্ষা করলাম।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ম্যানেজার বললেন: সব ভুয়ো মশাই, সব ভুয়ো। মানুষের বিচারবুদ্ধি, অভিজ্ঞতার গর্ব, শিকেয় ও সব তুলে রাখতে হবে।

পাহাড়ী মেয়েটি আমার জিনিসপত্র নিয়ে বারান্দায় তুলেছিল। ম্যানেজার চেঁচিয়ে উঠলেন: ও কি করেছিস! লেবেল-টেবেলগুলো দেখতে দে আগে।

ভদ্রলোক আর এক মুহূর্ত নষ্ট করলেন না। অত্যন্ত তৎপর ভাবে বাক্স-বিছানা উল্টে পাল্টে দেখলেন। বললেন : কোন লেবেলই তো নেই মশাই!

লেবেল কোথা থেকে আসবে! কে লাগাবে লেবেল!

কেন?

ও দুটো জিনিস তো আমি সঙ্গে করে এনেছি।

সবাই তো সঙ্গে করেই আনে, তবু লেবেল থাকে।

ভারি বিপদের কথা। দাঁড়িয়ে তর্ক করার চেয়ে বেরিয়ে পড়া ভাল। মেয়েটার দিকে চেয়ে বললাম : অন্য হোটেলে চল।

সে আশ্চর্য হয়েছিল, কিন্তু কথা কইল না। মালপত্র তোলবার জন্য নিঃশব্দে এগিয়ে গেল।

ম্যানেজার বললেন : অত চটছেন কেন? আপনাদেরই সুবিধের জন্যে তো এত কড়াকড়ি করছি।

সুবিধে চাই নে মশাই, একটু শান্তি চাই।

বলে রাস্তার দিকে পা বাড়িয়ে দিলাম।

ভদ্রলোক লাফিয়ে এসে পথ রোধ করলেন, বললেন : রাগ দেখিয়ে চলে যাবেন ভাবছেন! ওরে ও বাহাদুর!

বাহাদুরকে আবার কেন!

ভদ্রলোক উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠলেন : এইতো সাহস! এই সাহস নিয়ে আমাকে ভয় দেখাচ্ছিলেন!

ততক্ষণে বাহাদুর এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। তাকে বললেন : তিন নম্বর ঘর। মেয়েটি তৈরি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাহাদুরের পিছনে গিয়ে তিন নম্বর ঘরে ঢুকল।

ভদ্রলোক আমাকে বললেন : আসুন।

তাঁকে অনুসরণ করে আমি তাঁর অফিস ঘরে এলাম। বসতে হল।

ম্যানেজার তাঁর বাঁধানো খাতা খুলে গম্ভীর গলায় বললেন : মশায়ের নাম ?

সঞ্জয় রায়।

ভদ্রলোক আবার লাফিয়ে উঠলেন : অ্যাঁ !

ভারি জ্বালা !

জ্বালা তো আমার মশাই ! আপনি আবার দার্জিলিঙে এলেন কেন ?

আমাকে চেনেন নাকি ?

চিনি নে ! অত বড় মামলায় ফেঁসে আছেন ! কিন্তু আমি কী দোষ করেছি বলুন তো ! একজনের পর একজন যদি আমার ওপরে দয়া করেন তো আমি যে পাগল হয়ে যাব !

বড় অসহায় দেখাল ভদ্রলোককে। বড় করুণ, বড় উদ্বিগ্ন। বিরক্তির বদলে আমার বেদনা বোধ হল। বললাম : একটুখানি স্থির হয়ে কী হয়েছে বলুন।

ভয়ে ভয়ে ম্যানেজার বললেন : আমার কোমরে যে একটু আগে দড়ি পড়ে নি, এ আমার বাপের ভাগ্যি। শেষ জীবনে তিনি অনেক জপতপ করেছিলেন। আমি আজ হাতে-হাতে তার ফল পেলাম।

পুলিসের দড়ি !

এই তো একটু আগের ঘটনা। এখনও সবার বুক কাঁপছে।

তারপরেই ভদ্রলোক অন্তরঙ্গ ভাবে অত্যন্ত কাছে মুখ আনলেন। বললেন : বলুন না কী হয়েছিল সেদিন রাত্রে !

আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে। বললাম : আপনার খাতায় যা লেখবার লিখে নিন।

ভদ্রলোকও স্পষ্ট ভাবে বললেন : তার দরকার হবে না। বাহাদুর !

বাহাদুরের উত্তর পাওয়া গেল না। আমি বললাম : তাকে ডাকতে হবে না, আমি নিজেই যাচ্ছি।

বলে সেই অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

পাহাড়ী মেয়েটা পয়সার জন্য অপেক্ষা করছিল। বললাম ঃ চল অন্য হোটেলে।

বারান্দার সামনে ছোট একটুখানি লন। সেইখানে দাঁড়িয়ে জনকয়েক ভদ্রলোক রোদ পোয়াচ্ছিলেন। একজন ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন : চলে যাচ্ছেন যে ?

এই পাগলের হোটেলে কে থাকবে !

ম্যানেজারও যে আমার পিছনে বেরিয়ে এসেছিলেন, তা খেয়াল করি নি। এবারে বলে উঠলেন ঃ আর একটি অপদার্থ।

অপদার্থ !

রাগে সারা গা জ্বলে গেল। কিন্তু যাঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁদের শুধু কৌতুহল বাড়ল। একজন বলে উঠলেন ঃ কী নাম বলুন তো !

উত্তর ম্যানেজার দিলেন ঃ সঞ্জয় রায়।

সঞ্জয় রায় ! উঁহু, ও নামটা কোন অপদার্থের শুনি নি।

তখনি আমার মনোজ মিত্রের কথা মনে পড়ে গেল। কলকাতায় তার হত্যার মামলা চলেছে সাড়ম্বরে। বড় বড় হরফে সংবাদপত্রে সেই মামলার বিবরণ বের হচ্ছে। অপদার্থ সংঘের একজন বিশিষ্ট অপদার্থ মনোজ মিত্র খুন হয়েছে সংঘের ভবনে। এ নিয়ে প্রচুর ধরপাকড় হয়েছে। অভিযুক্তও হয়েছে জনকয়েক, কিন্তু আসামী নাকি সনাক্ত হয় নি। শুধুমাত্র সন্দেহের বশে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, এখন তাদের জবানবন্দী গ্রহণ করা হচ্ছে একে একে। কলকাতায় আমি সেই কাগজ পড়েছি। বুঝতে পারলাম, এখানে এঁরাও সেই কাগজ পড়ছেন। ম্যানেজার চেঁচিয়ে উঠলেন ঃ নিশ্চয়ই শুনেছেন।

অন্য ভদ্রলোকেরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন।

তাঁর ভুলটা আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তিনি ভুল করেন নি

বলে নিঃসন্দেহ ছিলেন। ছোট ছোট পা ফেলে তাঁর অফিস ঘর থেকে খবরের কাগজ একখানা বার করে আনলেন। মনোজ মিত্রের হত্যার মামলা। উপর থেকে নিচে অবধি কয়েকবার চোখ বুলিয়েও আমার নামটা খুঁজে পেলেন না। বললাম ঃ আমাকে দিন।

রবিবারের কাগজ। তাতে আমার একটা লেখা ছিল। সেইটা বার করে বললাম ঃ এইটের কথা বলছেন তো ?

এই তো !

বলে ভদ্রলোক প্রায় লাফিয়ে উঠেছিলেন। তারপরেই ঝিমিয়ে পড়লেন। বেশিক্ষণ নয়, শুধু একটি মুহূর্ত মাত্র। সামলে নিয়েই হাঁকডাক শুরু করলেন ঃ ওরে ও বাহাদুর, হতভাগা কোথাকার! দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল, ব্যাটারা পড়ে পড়ে এখনও ঘুমচ্ছে।

বাহাদুর বেরিয়ে এসেছিল।

ম্যানেজার আমাকে বললেন ঃ দুপুরের খাওয়া নিশ্চয়ই হয়েছে, তবে একটু চা খান।

গাড়ি আজ অনেক লেট ছিল, আমরা শিলিগুড়িতেই আহার সেরে নিয়েছি। বললাম ঃ চা আমার ঘরে দিতে বলবেন।

দুই

তিন নম্বর ঘরে আমি চারিদিকে চেয়ে দেখলাম। উত্তরের জানালাটি বন্ধ আছে, সেটি খুলে দিতেই চোখ জুড়িয়ে গেল। একটুও সন্দেহ রইল না যে এই জানলা দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়া দেখা যাবে। আজ যা মেঘে ঢাকা আছে, সকালের প্রথম রোদে কাল তা ঝলমল করে উঠবে। ওই উদার দিগন্তের দিকে তাকিয়ে প্রাথমিক অভ্যর্থনার খানিকটা গ্লানি মন থেকে মুছে গেল। আমি সহজ হবার চেষ্টা করলাম।

কিছুক্ষণ আগে যে এই হোটেলে একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে গেছে, তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সেই ঘটনার কথা কেউ বলেন নি। শুধু নিজের আতঙ্ক প্রকাশ করেছেন-নাটকীয় ভাবে। সুস্থ মাথায় সমস্ত কথোপকথন স্মরণ করলে একটা দুর্ঘটনা অনুমান করা সম্ভব হবে। হয়তো এখানে কোন ব্যক্তি ছিলেন, মনোজ মিত্রের হত্যার মামলায় তিনি গ্রেপ্তার হয়েছেন। এ ছাড়া অন্য কিছু অনুমান করা অসম্ভব মনে হয়।

দরজায় টোকা পড়তে আমি ভাবলাম, এবারে বুঝি বেয়ারা চা আনছে। তাকে ভিতরে আসবার অনুমতি দিলাম।

কিন্তু বেয়ারার বদলে অন্য এক ভদ্রলোক এলেন। মোটাসোটা রাশভারি চেহারা, কিন্তু গলার আওয়াজটি বড় মিহি। একেবারে কাছে এসে ফিসফিস করে বললেন : কলকাতা থেকে আপনিই বুঝি এলেন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

খুব ভাগ্যবান মশাই আপনি।

কেন ?

কেন ! আজ না এসে আপনি কালও তো আসতে পারতেন।

আজও তো আসতে পারতেন একটু আগে। তা না এসে আপনি এলেন সমস্ত ঝঞ্ঝাট মিটে যাবার পর। আপনার জন্যে ট্রেন আজ লেটে এল।

তা ভাগ্যবানই বটে।

একখানা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললাম: আপনার দুর্ভাগ্যটা কোন্‌খানে?

স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ করে যখন এই পাহাড়ে আসতে হল, তখনই জানি যে কপাল ভেঙেছে।

সেকি! আপনি স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ করেছেন?

ঐ একই কথা মশাই। বাড়িতে ফেলে আসাও যা, আর পরিত্যাগ করাও তাই।

কিন্তু কেন ফেলে এলেন?

ভদ্রলোক একটা বিষণ্ণ হাসি হাসলেন। বললেন: সে দুঃখ আপনারা বুঝবেন না, কেউই বোঝে না। দেশের সরকার খানিকটা বুঝলেও কিছু প্রতিকার হত। নুন আনতে যে পান্তা ফুরোয়, এ কথাটা কেউ বোঝে?

ভদ্রলোকের আপাদমস্তক আমি একবার ভাল করে দেখলাম। নুন-পান্তার শরীর নয়। নধর দেহে খাদ্যের বিজ্ঞাপন আছে লেগে। ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি বললেন: দয়া করে এই শরীর দেখে গরিবের বিচার করবেন না। একেবারে জলের শরীর, পেটে কিছুই আটকায় না। তা না হলে কি স্ত্রী পুত্রের মায়া ত্যাগ করে এই পাণ্ডববর্জিত দেশে পড়ে আছি!

পাণ্ডববর্জিত দেশ কেন বলছেন?

তা বটে। পাণ্ডবের সঙ্গে কৌরবও আছে দেখছি। একেবারে কুরুক্ষেত্র।

আপনি সেই কুরুক্ষেত্রের গল্প বলুন।

ভদ্রলোক ভয়ে ভয়ে নিজের চারিদিকে একবার চাইলেন। কোথাও কেউ নেই দেখে কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে একেবারে ফিসফিস করে বললেন : এই তিন নম্বর ঘরেই কুরুক্ষেত্র হল। সে বলব কি মশাই, একেবারে আপনার মতন চেহারা।

বলে আমার দিকে তাকালেন। আমার বেশভূষা দেখে বললেন : আপনার মতো ধুতি চাদর নয়—

নিজের দিকেও একবার তাকিয়ে বললেন : আমার মতো লুঙ্গিও নয়—

তারপর স্মরণ করে বললেন : দামী দামী পাতলুন। বেঢপ বড়লোকী ব্যাপার। আমরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকতাম।

গল্পটা অকারণে দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। সেই কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলাম। বললাম : কী হল সেই ভদ্রলোকের ?

ভদ্রলোক নয়, বলুন নির্মল সেন। তার পেটে যে এত ছিল, সে কি আমরা কেউ সন্দেহ করেছিলাম, না সকলেই এখন বিশ্বাস করতে পারছি!

এ দেখছি বিপদের কথা। ভদ্রলোক শুধু মন্তব্যই করছেন, কিন্তু ঘটনাটা খুলে বলার কোন লক্ষণ নেই। কিছু অসহিষ্ণু ভাবে বললাম : বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা পরে শুনব, আগে ঘটনাটা বলুন।

ঠিক আপনার বয়স মশাই নির্মল সেনের, ত্রিশ পেরিয়েছে কি পেরয় নি। একটু আগেও এই ঘরেই ছিলেন। আমাদের চোখের সামনে দিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে গেল।

কে ?

কে আবার! কোমরে দড়ি দেবার অধিকার যার আছে, সেই পুলিসে। তা না হলে আপনি আমি কি অন্যের কোমরে দড়ি দিয়ে নিজের কোমরে দড়ি লাগাবার ব্যবস্থা করব! বেশ বলেছেন!

সত্যিই কোমরে দড়ি দিয়েছিল ?

প্রায় সেই রকম। আপত্তি করলেই দিত।

এইবারে গল্পটা বলুন।

সত্যি বলব কি মশাই, আমরা কেউ কোন দিন ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করি নি। কারও সঙ্গে কথা নেই, বার্তা নেই, ঝগড়া বিবাদ নেই। একেবারে শান্ত শিষ্ট, ভালমানুষ। অথচ তিনিই নাকি মনোজ মিত্রকে খুন করেছেন।

দার্জিলিঙে থেকে কলকাতায় কী করে খুন করলেন ?

সেই কথাই তো আমরা ভাবছি। চিঠিতে মানহানি হয়, মোকদ্দমা হয়, কিন্তু খুন কী করে হয়, তা কিছুতেই বুঝতে পারছি না।

বলে ভদ্রলোক দরজার দিকে চাইলেন।

ভেবেছিলাম, এবারে তিনি কোন গোপন তথ্য প্রকাশ করবেন। কিন্তু তা করলেন না, বললেন: এ হোটেলের বেয়ারারা একেবারে অকেজো। ম্যানেজারবাবু নিজে বলে দিলেন, তবু আপনার চায়ের এত দেরি হচ্ছে।

চায়ের জন্যে আমার তাড়া নেই।

আপনার না থাকতে পারে, এদের তো থাকা উচিত। আপনি তো আর বিনি পয়সায় এদের হোটেলে থাকবেন না।

আমি কোন উত্তর দিলাম না দেখে ভদ্রলোক আরও ব্যস্ত হলেন, বললেন: দাঁড়ান, আমি দেখছি।

আপনি আবার কেন কষ্ট করবেন!

আমার আবার কষ্ট কিসের! হাঁকডাক করতে আমার মোটেই কষ্ট হয় না।

বলে বাহিরে বেরিয়ে ডাকাডাকি শুরু করলেন। অত বড় শরীরে এমন মিহি সুর খুব কমই শোনা যায়। বারান্দা পেরিয়ে সে ডাক বোধ

হয় বেয়ারার কানে পৌঁছল না। ফিরে এসে বললেন : এই হোটেলে এই সব অসুবিধে আছে। বেয়ারাদের কেউ কানে খাটো, কেউ আবার কানে তুলো দিয়ে রেখেছে। বাহাদুর লোকটা ভারি চালাক। আমি ডেকে মরে যাই, সাড়া দেবে না। ম্যানেজারবাবু মুখ খুলতে না খুলতেই সামনে হাজির হবে।

ম্যানেজারের গলার জোর আছে।

আমার নেই!

বলে নিজের দেহের দিকে তাকালেন।

ঠিক এই সময়ে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বেয়ারা ঘরে না এলে উত্তর দিতে আমার কষ্ট হত। ভদ্রলোক বললেন : দেখলেন তো, আমার আওয়াজও ওদের কানে পৌঁছেছে।

এ কথা অস্বীকার করে আমি আমার বিপদ বৃদ্ধি করলাম না। বললাম : আসুন, একসঙ্গেই চা খাই।

বেয়ারা বলল : আপনার কোকো কি এইখানে আনব ?

না না, আমি পরে খাব।

আমি বেয়ারাকে বললাম আর একটা পেয়ালা আনবার জন্যে।

ভদ্রলোক হেঁ হেঁ করে হাসলেন : কী যে করেন আপনি!

দ্বিতীয় পেয়ালা এলে তিনি আমার চায়ের ভাগ নিলেন। প্রসন্ন মুখে বললেন : দার্জিলিঙে এই একটি সুখ আছে। এখানকার চা-টা বড় ভাল। কলকাতার চা তো চা নয়, একেবারে বিষ। এক চুমুক পেটে গেলে অনেকক্ষণ দম আটকায়।

গম্ভীর ভাবে বললাম : আচার্য প্রফুল্ল রায় তো সেই কথাই বলেছেন।

অত দূর কেন, আমার ঘরেই আছেন এ কথা বলবার লোক। বাইরে আমি চা খেয়ে এসেছি শুনলে তাঁর কণ্ঠেই বিষ ঝরে।

সহাস্যে বললাম : তবে খান কেন ?

কেন খাই! ও একটা নেশা মশাই, চায়ের জন্যে প্রাণ আই ঢাই করে। খেয়ে দেয়ে শোবার তো জো নেই, বাইরে পায়চারি করছিলাম আর ভাবছিলাম, কতক্ষণে চা হবে। আজ আপনার জন্যেই একটু তাড়াতাড়ি হল, আমাদের এখনও দেরি আছে।

নেপথ্যে ম্যানেজারের গলা শোনা গেল। খানিকক্ষণ পরেই দরজায় টোকা দিয়ে বললেন : ভেতরে আসতে পারি ?

আসবেন বৈকি!

ম্যানেজার ঘরে ঢুকে চমকে উঠলেন : একি অনাদিবাবু, আপনি এখানে বসে চা খাচ্ছেন!

অনাদিবাবুর মুখ তখন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। বললেন : কী করব বলুন, ভদ্রলোক আদর করে দিলেন।

আমি ব্যস্ত ভাবে বললাম : তাতে কী হয়েছে!

ম্যানেজার একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেলে বললেন : কী হয়েছে! ওঁর স্ত্রী আমায় বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছেন, চা যেন ওঁর পেটে না পড়ে। তাই ওঁকে ওভালটিন দিই, কফি দিই, কোকো দিই—যখনই তেষ্টা বলেন তখনই কিছু গরম খেতে দিই। দূরের এক মহিলার একটা সামান্য অনুরোধ, তাই আমি রক্ষা করতে পারছি না।

কাতর স্বরে অনাদিবাবু বললেন : এ নিয়ে আর বাড়াবাড়ি করবেন না ম্যানেজারবাবু।

অভিভাবকের মতো ম্যানেজার বললেন : আপনি এ ঘরে কেন এসেছিলেন ?

উত্তরটা আমি দিলাম, বললাম : চা খেতে উনি আসেন নি। চা আমি দিয়েছি।

আর্তনাদের সুরে অনাদিবাবু বললেন : বলুন সঞ্জয়বাবু, ব্যাপারটা আপনি বুঝিয়ে বলুন।

নিজে আর বসলেন না। অসমাপ্ত পেয়ালাটি নামিয়ে রেখেই পালিয়ে আত্মরক্ষা করলেন।

ম্যানেজার বললেন: আপনি আমাকে নিশ্চয়ই অসভ্য ভেবেছেন, সেই জন্যেই আবার আপনার কাছে এলাম।

না না, অসভ্য কেন ভাবব! এত বড় একটা দুর্যোগ গেল আপনাদের ওপর দিয়ে—

গেল কোথায়! এল বলুন। আমাদের নিয়ে টানা-হেঁচড়া তো এখন শুরু হবে।

তা আপনারা কী করবেন?

জানি নে।

তবে ভয় পাচ্ছেন কেন?

আমার নাম তো নিয়েছেই। হোটেলের সমস্ত বোর্ডারের নাম পুলিসে লিখে নিয়ে গেছে। শুনতে পাচ্ছি, শুধু দার্জিলিঙ নয়, কলকাতা পর্যন্ত নাকি টানাটানি করবে। আপনিই বলুন, আমি ব্যবসাদার মানুষ—

সত্যিই তো!

ভদ্রলোক খুশী হলেন। বললেন: আমার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখুন।

তারপর তাঁর মুখখানা একেবারে আমার কানের কাছে এনে বললেন: আর একটা মেয়ে বোধ হয় জড়াবে, তবে সে পালিয়েছে শুনলাম।

এই হোটেলের মেয়ে?

ভদ্রলোক গর্বিত ভাবে বললেন: পাশের হোটেলের। দিন কয়েক থেকে দুজনকে আমরা এক সঙ্গে দেখছিলাম। ঘরের ভেতর সারাক্ষণ গুজগুজ করছে। তারপর হাত ধরে বেড়ানো। আমরা ভাবতাম—

বলে ম্যানেজার তাঁর চোখজোড়া ছোট করলেন। কী ভাবতেন, তা তাঁর মুখের ভঙ্গি দেখে বুঝতে বাকি রইল না। বললাম : তারপর ?

এখন শুনছি, সে মেয়ে নাকি উধাও। তার বুড়ো বাপও পালিয়েছে। সঠিক খবরটা সংগ্রহ করতে বাহাদুরকে পাঠিয়ে এলাম।

ব্যাপারটা তাহলে ঘোরালো মনে হচ্ছে।

বিলক্ষণ। তবে কি জানেন, এখানকার পুলিস কোন গণ্ডগোল করবে না। আমরা এখানকার পুরানো কারবারী, পুলিসের সঙ্গে আমাদের সদ্ভাবই আছে। পাকা বন্দোবস্ত। মুশকিল হয়েছে কলকাতার গোয়েন্দা নিয়ে। ভেতরে ভেতরে তারা নাকি কাজ করছে। ওরা তো আর ছেড়ে কথা কইবে না !

তা তো বটে।

উৎসাহ পেয়ে ভদ্রলোক বললেন : এ সবের আমরা কী জানি মশাই ! হোটেল খুলে বসেছি। আপনি এলেন, নাম পরিচয় ঠিকানা লেখালেন, ঘরে এসে ঢুকলেন। আমার হচ্ছে আপনাদের যত্ন আর টাকার সঙ্গে সম্বন্ধ। আপনি খুনে না গোয়েন্দা, তার আমি কী জানি !

দরজার পাশ থেকে কেউ সরে গেলেন মনে হল। শব্দটা ম্যানেজারের কানেও গিয়েছিল। তিনি হাঁক দিলেন : কে ?

কোন উত্তর এল না।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে বাহিরটা একবার দেখে এলেন। কেউ নাকি কোথাও নেই, শুধু কয়েকজন বোর্ডার রোদে দাঁড়িয়ে এখনও জটলা করছেন। বললেন : বিপদের কথা। আমাদের পিছনে আবার গোয়েন্দা লাগল না তো !

ভদ্রলোকের চোখে মুখে আমি আতঙ্কের লক্ষণ দেখলাম। স্থির হয়ে বসতে পারলেন না, বললেন : দেখি একবার, বাহাদুর কী খবর আনল।

বলে বেরিয়ে গেলেন।

তিন

এতক্ষণে আমি একটু আরাম পেলাম। এসে অবধি কথা শুনে আর কথা বলে ক্লান্তি এসেছিল। এবারে একটু বিশ্রাম পাব। সারা রাত ট্রেনে কেটেছে, সারা দিনটাও। বিশ্রামের লোভে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছি। এবারে চায়ের সরঞ্জাম সরিয়ে রেখে একটা চুরট ধরালাম।

কলকাতায় আমি সিগারেট খাই। শখ করে শীতকালে দু একটা চুরট চলে। দার্জিলিঙ শীতের দেশ বলে এক বাক্স ভাল চুরট এনেছি। সেই বাক্স কার্সিয়ঙে খুলেছিলাম, এখানে শেষ করব।

আর একটি কাজ করবার বাসনা আছে। একখানি বই লেখার বাসনা। কলকাতার জীবনে অখণ্ড অবকাশ নেই, সাহিত্যের চিন্তা পদে পদে ব্যাহত হচ্ছে। সবচেয়ে বড় চিন্তা সেখানে জীবনযুদ্ধের। সারাটা পথ আমি ভেবেছি। বিষয়বস্তুর ভাবনা। আধুনিক উপন্যাস সম্বন্ধে অনেক আলোচনা ও সমালোচনা পড়েছি। কেউ ইতিহাস নিয়ে উপন্যাস রচনা করছেন, কেউ সংবাদপত্রের ঘটনা নিয়ে। বাস্তব ঘনিষ্ঠ লেখা হচ্ছে না বলে অনুযোগ শোনা যাচ্ছে, জীবনবোধের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না বলে ক্ষোভ দেখা দিচ্ছে। কাজেই গল্প লেখা উচিত নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ উপাদান নিয়ে। সেই উপাদানে সত্যের সন্ধান থাকলে লেখা ওতরাবেই। কিন্তু এ সব সম্পদ আমার মুঠোর ভিতর নেই। আমাকে কল্পনার সাহায্যেই কাহিনী বয়ন করতে হবে। বাস্তবের রঙ তাতে যত চড়াতে পারি, তত তা স্বাভাবিক হবে।

এ যুগের সমাজ নিয়ে লেখায় বিপদ আছে। সমাজের কোন ক্ষেত্রে কোন প্রগতির আশ্বাস পাওয়া যাচ্ছে না। শিশুরা শিখতে চায় না, ছাত্ররা না পড়ে পাস করবে, কর্মীরা মজুরী নেবে ফাঁকি দিয়ে। শ্রমের দাম

নেই, টাকার মূল্য কমে যাচ্ছে, সততা শেষ হয়ে গেছে ; এখন শুধু একটা জান্তব জীবন যাপন। এই জীবনের বাস্তব চিত্র হবে নরকের কল্পনার মতন। তার চেয়ে অন্য কিছু লেখা ভাল। কিন্তু কী লিখি !

দরজার বাহিরে হঠাৎ চুড়ির শব্দ পেলাম। সেই সঙ্গে একটু মৃদু শব্দ : আসতে পারি ?

নিশ্চয়ই।

বলে আমি উঠে দাঁড়ালাম।

পর্দা ঠেলে একজন মহিলা ভিতরে এলেন। ক্ষীণ দেহ, ফর্সা রঙ, চোখে চশমা। একখানা সাদা সুতোর শাড়ি পরনে, জামার রঙ তার আঁচলের মতো। এক নজরে এর চেয়ে বেশি দেখা সম্ভব নয়। একখানা চেয়ার এগিয়ে দেবার সময় আর যা দেখলাম, সে হল একটু শুকনো হাসি। ঐ হাসি দিয়ে মেয়েটি হাত জোড় করলেন : নমস্কার।

নমস্কার। বসুন।

নিরুত্তরে মহিলা বসলেন, কোন কথা কইলেন না।

আমার ভারি অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। কিছু বলতে না পারার জন্য অস্বস্তি। মহিলার মুখে চোখে দুর্ভাবনার ছায়া, উদ্বিগ্ন বিষণ্ণ। তিনি যে মনোজ মিত্রের খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়বার আশঙ্কা করছেন, তাতে আমার একটুও সন্দেহ রইল না। তাঁর কাতর দৃষ্টিই ম্যানেজারের উক্তিকে সমর্থন করছে। বললাম : আপনি তো পাশের হোটেলে আছেন ?

এখানেই উঠে এসেছি।

আমি আশ্চর্য হলাম। এইটুকু সময়ের মধ্যে হোটেল বদল হয়ে গেল ! না ম্যানেজারের অজ্ঞাতে তিনি এখানে উঠে এসেছেন ! জিজ্ঞাসা করলাম : কোন্ ঘরে আছেন ?

আপনার পাশেই।

ভারি আশ্চর্যের ব্যাপার। আমরা কোনই সাড়া শব্দ পাই নি।

মহিলা বললেন : ওরা রান্নায় বড় ঝাল দিত, তাই এখানে উঠে এসেছি।

আপনার বুঝি—

কোন ব্যক্তিগত প্রশ্ন অনুচিত হবে ভেবে থেমে গেলাম।

কিন্তু মহিলা উত্তর দিলেন : অনেক দিন মাষ্টারি করে পেটের হজমশক্তি ফুরিয়ে গেছে।

তাঁর বয়সের কথা এতক্ষণ ভাবি নি। এবারে তাই অনুমানের চেষ্টা করলাম। ত্রিশ বছর নিশ্চয়ই হবে না। চোখের চশমা আর গম্ভীর মুখ দেখে বছর ত্রিশেক মনে হচ্ছে। হেসে বললাম : মাষ্টার মশাইরা চাকরি নিয়েই ওই রকম বলে থাকেন।

আমার বেলায় ভাববেন না যে চাকরিটা আমি সম্প্রতি নিয়েছি, আমার ছাত্রীরাও মাষ্টার হয়েছে।

এক বছর আগে পাস করলেই তা সম্ভব হয়। সাধারণ ভাবে বছর তিনেকই যথেষ্ট। এম. এ. পাস করে ফোর্থ ইয়ারের গোটা কয়েক ক্লাস নিলেই হল।

আমি ধরে নিয়েছিলাম যে এই মহিলা কলেজে পড়ান। বোধ হয় ঠিকই ধরেছি। উত্তরে তাই তিনি হাসলেন, কোন প্রতিবাদ করলেন না।

এই হাসিতে খানিকটা সহজ ভাব ছিল। তাই পরিচয় জানতে চাইলাম : আমার নাম—

সঞ্জয় রায়।

আমি চমকে উঠে প্রশ্ন করলাম : আপনি চেনেন আমাকে ?

না চিনলে আলাপ করতে আসব কেন! আমার নাম কল্যাণী চৌধুরী।

আমাকে বিভ্রান্ত দেখে মহিলা হেসে বললেন : ম্যানেজারবাবুর

কাছে আপনি যখন নাম লেখাচ্ছিলেন, তখন আমি শুনেছি। আপনার লেখাও পড়েছি। 'আদালতের আত্মকথা' তো আপনারই লেখা!

আপনি পড়েছেন বুঝি?

পড়েছি।

আশা করেছিলাম যে এবারে কল্যাণী বোধহয় বইয়ের সম্বন্ধেই কিছু বলবেন। কিন্তু তা বললেন না। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বললাম: কেমন লেগেছে?

প্রশ্নটা করেই বড় লজ্জা বোধ হল। এমন করে মতামত চাইলে কি কেউ মন্দ বলতে পারেন, না সেই ভাল বলার কোন দাম আছে! লেখককে সামনে পেয়েও পড়া বই সম্বন্ধে যাঁরা নির্বাক থাকেন, তাঁরা মন্দ বলতে চান না ভাবাই সঙ্গত। আমাদের দুর্বলতা তবু যায় না।

কল্যাণী বললেন: কিছু যদি মনে না করেন তো বলি।

অসঙ্কোচে বলুন।

পড়তে নিঃসন্দেহে ভাল লাগে, সে আপনার বইয়ের বিষয়বস্তুর জন্যে। ফৌজদারি আদালতে যে সমস্ত অপরাধের বিচার হয়, তার প্রতি আমাদের সনাতন দুর্বলতা। আমাদের আদিম প্রবৃত্তিতে সুড়সুড়ি লাগে বলে আমরা খবরের কাগজে মামলার পাতাটা মনোযোগ দিয়ে পড়ি। জেল-খানার গল্পের চেয়েও আপনার গল্প মুখরোচক হয়েছে এই কারণে যে, যারা ছাড়া পেয়েছে তাদের কথাও আপনি লিখেছেন। আজকের সমাজে ছাড়া পায় তো দাগী আসামীরা, যারা বিচারকের বিচার করছে আদালতের বাইরে।

এ অভিযোগ আমাকে মেনে নিতেই হবে। আমি ফৌজদারি আদালতের উকিল। বয়সে প্রবীণ হই নি, অভিজ্ঞতাতেও নয়। নতুন মামলায় তাই কৌতূহলের আস্বাদ পাই। এই আস্বাদই আমার লেখার ভিতর সঞ্চারিত করে দিয়েছি। আমি কোন উত্তর দিতে পারলাম না।

কল্যাণী বললেন : আমাদের সমাজজীবনে আজ দুটো ধারা বড় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—ক্রাইম আর সেক্স্। এ দুটোর এমন একটা আকর্ষণ আছে যে সর্ব শ্রেণীর জীবকে সারাক্ষণ পাহারা দেবার প্রয়োজন আছে। আমাদের দেশের মুনি ঋষিরা তাই নানা রকমের সংহিতা প্রণয়ন করেই ক্ষান্ত হন নি, নানা দেব দেবী ও ভগবানকেও সৃষ্টি করেছেন। সেই ভগবানের পাহারাই সব চেয়ে বড় পাহারা। দুর্বলচিত্তরা তাঁরই ভয়ে কাবু থাকে।

আমার মনে হল, কল্যাণী এর পরেই আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবেন, আমি 'আদালতের আত্মকথা' লিখে দুর্নীতির প্রচার করেছি। কিন্তু তাঁর আর একটু সমালোচনা বাকি ছিল। বললেন : অপরাধীর ভিতর আপনি মহত্বের অন্বেষণ করেছেন। শরৎচন্দ্রও করেছিলেন তাঁর কয়েকটি নায়িকার বেলায়। পড়তে বেশ লাগে। পাপীরাও তো মানুষ, তাদেরও প্রাণ আছে। কিন্তু তার ফল কী হচ্ছে? বাঙলা খবরের কাগজ পড়ে দেখুন।

বিব্রত ভাবে আমি বললাম : কঠিন ভাবে নিন্দা করলে বোধ হয় ভাল হত।

হত না। সমাজে নোংরামি আছে, এ কথা স্বীকার করাই অন্যায়। আদালত করুক, খবরের কাগজ করুক, কিন্তু সাহিত্য করবে না। দিনের আলোয় যে ছবি ক্যামেরায় ওঠে, সাহিত্যে সমাজের সেই ছবি উঠবে। গভীর অন্ধকারে সমাজের যে গোপন অভিসার, তাকে আবিষ্কার গোয়েন্দারা করুক, সাহিত্যিকের এ কাজ নয়।

মনে হল, কল্যাণী তাঁর কলেজের ক্লাসে সাহিত্যের পাঠ দিচ্ছেন। সহসা সেই কথাটি বুঝতে পেরে লজ্জিত হয়ে উঠলেন। বললেন : কী বিশ্রী অভ্যেস দেখুন। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসে যত সব আজেবাজে বকছি।

আলাপ মানেই তো আজেবাজে বকা। যিনি যত বাজে বকেন, তিনি তত সদালাপী বলে পরিচিত।

আলাপের বিষয়বস্তু ভাল হওয়া দরকার। কিন্তু আমি আপনার কাছে একটা প্রয়োজনের বিষয় নিয়ে আলাপ করতে এসেছিলাম।

প্রয়োজন! আমার কাছে কল্যাণী চৌধুরীর কী প্রয়োজন থাকতে পারে! মনোজ মিত্রের মামলার সঙ্গে কি জড়িয়ে পড়বার ভয় পাচ্ছেন! তার জন্যেই কি তাঁর আইনের সাহায্য চাই! কিন্তু আমি তাঁকে সহজ ভাবে বললাম ঃ বেশ তো।

কল্যাণী বললেন ঃ আপনার পরিচয়টা জেনে অবধি ব্যস্ত হয়েছি, কিন্তু আপনাকে একা পাচ্ছি না। অনাদিবাবু বেরবার আগেই ম্যানেজারবাবু ঢুকে পড়লেন। দেরি করলে হয়তো আর কেউ এসে ঢুকতেন। নির্মলবাবু গ্রেপ্তার হবার পর থেকেই সবার প্রাণে একটা বেয়াড়া ভয় ঢুকেছে। অন্য কোন কথা কেউ আর ভাবতে পারছেন না। আজ বোধ হয় বেড়াতেও বেরবেন না।

আপনাদের ভয় কিসের ?

শুনতে পাচ্ছি, পুলিস নাকি সমস্ত বোর্ডারের নাম লিখে নিয়ে গেছে।

তাই বলে সমস্ত বোর্ডারকে তো গ্রেপ্তার করতে আসবে না!

মিস্টার ঘোষ নামে এক ভদ্রলোক তো ট্যাক্সি ডেকে পালিয়ে গেলেন। নির্মলবাবুর সঙ্গে তাঁরই মেলামেশা ছিল সব চেয়ে বেশি। কলকাতার ঠিকানাও বোধ হয় বদলে দিয়ে গেছেন।

সত্যি ?

ম্যানেজারবাবুকে টাকা দেবার সময় চুপিচুপি বললেন, দেখুন তো বাড়ির নম্বরটা কত দিয়েছি। মনে হল যেন পালটে দিলেন।

ভালই করেছেন। কলকাতার মতো শহরে বাড়ির নম্বর না মিললে

পুলিসকে হয়রান হতে হবে। প্রতিবেশীকে তো সেখানে কেউ চেনে না।

আমারও সেই ভয়।

নির্মলবাবুর সঙ্গে—

না না, নির্মলবাবুর সঙ্গে নয়। ওঁদের সংঘের সঙ্গে এক সময় আমার একটু সম্বন্ধ ছিল। সংঘের খাতায় আমার নাম ঠিকানা আছে। কাগজে পড়েছি যে পুলিস নাকি সবার নামধাম লিখে নিয়ে গেছে।

তাতে আপনার ভয় পাবার কী আছে!

কিছু নেই তো?

অপদার্থ সংঘের নাম আমি কোনদিন শুনি নি। শুনেছি এই হত্যার মামলা শুরু হবার পর। সংঘের সভ্যদের এরা অপদার্থ বলে। বিশেষণ নয়, বিশেষ্য। অপদার্থ বলে এরা পরস্পরকে সম্বোধনও করে। সংঘের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমার কোন স্পষ্ট ধারণা হয় নি। কল্যাণীর কাছে সেই কথা আমি ব্যক্ত করলাম।

কল্যাণী বললেন ঃ তাহলে আমাকে গোড়া থেকেই শুরু করতে হয়।

অপদার্থ সংঘের কথা আমি গোড়া থেকেই শুনলাম।

এই সংঘের জন্ম হয়েছিল যুদ্ধোত্তর যুগে। এক শ্রেণীর মানুষের যখন অভাবে নাভিশ্বাস উঠেছে, আর এক শ্রেণীর মানুষ তখন কাঁচা পয়সার গরমে সংযম হারিয়েছে। পা পড়ছে বেসামাল ভাবে, কী করা উচিত ভেবে পাচ্ছে না। কাঁচা পয়সা যাদের হাতে চিরকাল থাকে, তারা ফেঁপে-ফুলে উঠল। দোকানে কর্মচারী বসিয়ে তারা কারখানা খুলল। মাটি কাটার ঠিকাদার নিল কারখানা গড়বার কনট্রাক্ট। এ সব তো অবাঙালী ব্যবসাদার। বাঙালীর ব্যাপার অন্য রকম। কাঁচা পয়সার আস্বাদ তার কাছে মদের নেশার মতো। সিন্দুকে তুলে শান্তি নেই, আকণ্ঠ উপভোগ করে নেশায় বুঁদ হবার বাসনা। এমনই এক দল

যুবক পার্ক স্ট্রীটের একটা বারে বসে একটি সংঘ স্থাপনের সংকল্প করল। একেবারে নিজস্ব ব্যাপার। আনন্দে উদ্দাম হলেও কারও কিছু বলবার নেই, গলা ধাক্কা দিয়ে কেউ বার করে দিতে পারবে না।

জেনে শুনে এই রকম একটা প্রতিষ্ঠানে কল্যাণী চৌধুরী কেন যোগ দিলেন, সেই কথা ভেবে আমার আশ্চর্য লাগল। কিন্তু কোন প্রশ্ন কর-বার সাহস পেলাম না। কল্যাণী চৌধুরী কিন্তু আমার মুখে এই ধরনের একটা প্রশ্নের প্রত্যাশা করেছিলেন। তাই তিনি নিজেই বললেন : এমন একটা সংঘে আমি কেন যোগ দিলাম, তা বলে রাখা দরকার। নিজের প্রয়োজনে আমি আসি নি, এসেছিলাম বন্ধুর অনুরোধে। অর্থ ব্যয়ের বাসনায় নয়, অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের অভিলাষে। অল্প দিনেই আমি অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলাম।

কল্যাণী চৌধুরী শুনেছিলেন যে বর্তমান যুগের কয়েক জন আদর্শবান স্ত্রী-পুরুষ একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, আবার ক্লাব জাতীয় আড্ডার স্থানও নয়। শিক্ষিত অভিজাত নরনারী একত্র মিলিত হয়ে সার্থক কাজে অবসর যাপন করবে। কিছু দিন বোধ হয় করেছিল। প্রতিষ্ঠাতারা না করলেও আর কয়েক জনের সাধু উদ্দেশ্য ছিল। অন্তত কল্যাণী চৌধুরী প্রথম প্রথম কোন সন্দেহ করেন নি।

যে বাড়িটা ভাড়া নেওয়া হয়েছিল, তাতে অনেকগুলি ঘর ছিল। ঘরগুলি বিচিত্র ভাবে সাজানো, তাদের বিচিত্র নাম। কোথাও তাস পাশা, কোথাও শুধু ধূমপান আর আলোচনা, কোন ঘর একেবারে নিস্তব্ধ, আবার উন্মত্ত কোলাহলও কোন ঘরে। যে ঘরে পড়াশুনো হত, তার পাশের ঘরে যেতেন কল্যাণী চৌধুরী। সেখানে তাঁরা সমাজনীতির আলোচনা করতেন।

মহেশবাবু নামে এক ভদ্রলোক সমাজটা উৎসন্নে যাচ্ছে বলে বড়ই

উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে ভরতবর্ষ এক দিন স্বাধীন হবেই, মানে ভারতবর্ষের লোকেরা স্বাধীনতা আদায় করতে পারবে না, ইংরেজ তাদের স্বাধীনতা দিয়ে যাবে। কিন্তু তার আগে জাতির মেরুদণ্ড দেবে ভেঙে। ঐ ভাঙা মেরুদণ্ড জোড়া লাগাবার আগেই যেন আর কোন জাত দেশটা দখল করতে পারে। অনেকে এ কথা মানত না বলে তর্কটা জোরালো হত। মহেশবাবু বলতেন, চরিত্রবল মানুষের সব চেয়ে বড় বল। আর এই চরিত্রটাই তারা দুর্বল করে দিয়েছে। সাধারণ লোকের স্বভাব তো অভাবেই নষ্ট হয়েছে। নেতাদের অনেকেই দেখা যাচ্ছে বাবু হয়ে গেছেন। যাঁরা চিরকাল স্বাধীন অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখেছেন, তাঁরাই নাকি চুপিচুপি খণ্ডিত ভারতের পরিকল্পনা করছেন। নিজেদের মধ্যে দলাদলি, এক দল ছেড়ে অন্য দলে গিয়ে যোগ দিচ্ছেন নির্বিচারে। এক জনের পিছনে অন্য জন লাগছেন।

রাজনীতিতে কল্যাণী চৌধুরীর রুচি ছিল না। তিনি সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে উদ্বিগ্ন হতেন। এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার আগে থেকেই দেখতে পাচ্ছিলেন যে সংসার প্রায় অচল হয়ে আসছে। পিতার রোজগারে আর সংসার চলে না। কিছু উপ্‌রি টাকা চাই। এই উপ্‌রি টাকা আজকাল নানা ভাবে আসছে, কিন্তু তাতে তাঁর পিতার একেবারে প্রবৃত্তি নেই। তাঁর পুরাতন ধ্যান ধারণায় ঐ জাতের রোজগারের নাম পাপের পয়সা। সংসারে ঐ পয়সা এলে পরিবারের অকল্যাণ হবে। কাজেই থাক অভাব, ভগবান মুখ তুলে চাইলে সুদিন আসবে।

কল্যাণী চৌধুরী তাই এম. এ. পাস করেই চাকরি নিলেন একটা মেয়েকলেজে। তাতে শুধু একটা পরিবারের অভাব ঘুচল। সমাধান হল না তার চেয়ে বড় সমস্যার। মা বললেন, মেয়ে বড় হয়েছে, কিন্তু সে ছেলের মতো সংসারের ভার বইবার জন্য বড় হয় নি। এই যে সে

স্বেচ্ছায় কাঁধে জোয়াল তুলে নিল, আর কি সে নামাতে পারবে! তার নিজের জীবনটা বুঝি নষ্ট হয়ে গেল।

মহেশবাবুর মন্তব্যগুলো বড় কঠিন হত। একটা দেশকে পঙ্গু করে দেবার জন্য নাকি এর চেয়ে সহজ উপায় আর নেই। দেশের অর্ধেক খাদ্য রাতারাতি লুকিয়ে ফেল। বাকি অর্ধেক নিয়ে দেশশুদ্ধ লোক কাড়াকাড়ি কামড়াকামড়ি করবে। যারা ব্যবসা করে, তারা কালোবাজার করবে, যারা ঐ খাদ্যের ভাগবাঁটোয়ারার ভার পাবে, তারা ঘুষ খাবে। খাদ্যের পরে অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস ধরে টানো। দেশের সব মানুষ এক রকম হয়ে যাবে। পেটে খেতে না পেয়ে উলঙ্গ মানুষ কত দিন সৎ থাকবে! এক তাড়া কাগজের নোট ছেপে হরিলুটের মতো তাদের মুখের সামনে ছড়িয়ে দাও, খুন রাহাজানি নারীহরণ সব শুরু হয়ে যাবে।

মহেশবাবুর কথা মিথ্যা হয় নি, দেশে সবই শুরু হয়েছে। দুষ্কৃতি বৃদ্ধি পাচ্ছে দিনে দিনে। এ দিকে দৃষ্টি দেবার কারোর অবকাশ নেই। কারণ খণ্ডিত ভারত এখন নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। মহেশবাবু বলেছিলেন, সমস্ত সমস্যা এখন শিকেয় তুলে রেখে দেশের লোকের চরিত্র গঠনের চেষ্টা করা উচিত। পাঁচসালা যোজনার কথা শোনা যাচ্ছে। তাতে কোটি কোটি টাকা খরচ হবে। দরকার হলে বিদেশ থেকে নাকি টাকা ধার করবে। মহেশবাবুর ধারণা ছিল যে এই দেশে যথেষ্ট টাকা আছে, খরচ করে তা শেষ করা যাবে না। এত খাদ্য আছে যে খেয়ে কোন দিন ফুরবে না। এক দল ফটকাবাজের হাতে পড়ে দেশের লোক খাবি খাচ্ছে, আর সরকার কী প্রতিকার করবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

মহেশবাবুর ধারণা, এই সরকারের বেশি টাকাই অপব্যয় হবে। এত চুরি হবে যে নদীর বাঁধে জল আটকাবে না, কিংবা বন্যায় বাঁধ ভেঙে যাবে। ইস্পাতের কারখানায় লোহা হয়তো হবে, কিন্তু শক্ত ইস্পাত হবে না। একটা চরিত্রহীন জাতের কাছে—

উইথ্‌ড্র—বলে সেদিন যে ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে পড়েছিল, তারই নাম মনোজ মিত্র। অদ্ভুত সুন্দর চেহারা, দীর্ঘ বলিষ্ঠ। একবার দেখলে তাঁকে জনতার ভিতর থেকে চিনে বার করতে একটুও কষ্ট হবে না। মনোজ মিত্র বলেছিল, দেশের মাটিতে বসে দেশের লোকের নিন্দা করতে আপনার লজ্জা করে না!

পর দিন মহেশবাবু আর এলেন না, তার পর দিনও না। মহেশ বাবুকে আর কখনও আমি সংঘের ঘরে দেখি নি। কিন্তু মনোজ মিত্রকে দেখেছি দিনের পর দিন, নানা জায়গায়, নানা ভাবে। তাঁর বন্ধু নির্মল সেনকেও দেখেছি, এই ঘর থেকে যিনি গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। আরও অনেক কিছু দেখেছি যা কোন দিনই কারও কাছে খুলে বলতে পারব না।

আমি আশ্চর্য হচ্ছিলাম এই ভেবে যে এত কথাই বা কল্যাণী চৌধুরী আমার কাছে কেন বলছেন! আমার সঙ্গে তাঁর কোন পরিচয় ছিল না, ভবিষ্যতেও থাকবে না। পরিচয়ের প্রথম দিনেই এত কথা বুঝি বিসদৃশ ঠেকছিল। তবু আমি সহজ ভাবেই উত্তর দিলাম : নাই বা সে কথা খুলে বললেন।

বাহিরের রাজপথে আর রৌদ্রালোক নেই। পাহাড়ের আড়ালে সূর্য অন্তর্হিত হয়েছেন। মেঘের সঙ্গে তাঁর লুকোচুরি খেলা যে অনেক আগেই সমাধা হয়েছে, ঘরের ভিতরে আমরা তা লক্ষ্য করিনি। কল্যাণী সহসা সচকিত হয়ে বললেন : ছি ছি, বড় বিশ্রী ভাবে আপনাকে আটকে রেখেছি। আপনি যে আজই এসেছেন, সে কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম।

উঠে দাঁড়িয়ে আবার দু হাত যুক্ত করলেন। বললেন : সন্ধ্যাবেলায় আবার একবার বিরক্ত করতে আসব।

বেশ তো।

তখন আর 'বেশ তো' বলবেন না। আপনাকে তো গল্প শোনাতে আসি নি, এসেছি পরামর্শ নিতে—উকিলের পরামর্শ।

হেসে বললাম ঃ ফী দেবেন তো ?

চাইলে দিতেই হবে।

ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে বললেন ঃ ভেবেছিলাম, দার্জিলিঙেরই কোন উকিলের কাছে যাব। আমাদের নাম যেদিন পুলিসে লিখে নিয়েছে বলে পড়লাম, সেদিন থেকে আমার আর দুর্ভাবনার অন্ত নেই।

যারা ভাবতে জানে, দুর্ভাবনা তাদেরই জিনিস। আনন্দের ভাবনা ভাবে কবি পাগল আর প্রেমিক।

কল্যাণী চৌধুরী হেসে বললেন ঃ আমি কোনটাই না।

চার

জানালায় দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, আজ বেরব কিনা। দেহে ক্লান্তি খুব বেশি নেই, মনে একটুও উৎসাহ পাচ্ছি না। হোটেলের মানুষগুলো দেখেই কি আমি ঝিমিয়ে গেলাম!

চোখের সামনে কোন দুর্ঘটনা দেখলে মানুষ বিচলিত হয়, অনেকক্ষণ পর্যন্ত মন তার আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, তার পরেও আলোচনা চলে আরও কিছুক্ষণ। এ সবই স্থির জলে একটা ঢিল পড়ার মতন। জলে খানিকটা আলোড়ন হয়ে আবার সব শান্ত। কিন্তু এই গ্রেপ্তারের ব্যাপারে একটু ব্যতিক্রম দেখছি। নির্মল সেন বলে একটা মানুষ অনেকক্ষণ আগে ধরা পড়েছে। তার সঙ্গে কারও বিশেষ জানাশোনা ছিল না। কোন দুর্ঘটনাও ঘটে নি কারও চোখের সামনে। শুধু গ্রেপ্তার। এই সামান্য ব্যাপারটা এতগুলো মানুষকে কেন এতক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখবে! শুধু কি পুলিশের ভয়, না এর সঙ্গে আর কিছু জড়িয়ে আছে!

ঘরের বাহিরে হঠাৎ অনাদিবাবুর গলা শুনতে পেলাম। ভদ্রলোক বোধ হয় আমাকেই ডাকলেন। দরজার পর্দা সরিয়ে আমি বাইরে এলাম। বললাম ঃ বাইরে কেন, ভেতরে আসুন।

না না, আমাকে আর ভেতরে যেতে বলবেন না।

কেন?

বাইরে ম্যানেজার, ভেতরে আপনি। আমি যে মশাই ত্রিশঙ্কু হয়ে রইলাম।

আমি তাঁর ভয় দেখে হাসলাম।

হাসি নয় মশাই, হাসি আমার শুকিয়ে গেছে। শুধু একটি

কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি। আমি কি আপনার কোন ক্ষতি করেছি?

অদ্ভুত প্রশ্ন। বললাম: ক্ষতি কেন করবেন!

তবে আমাকে কেন জড়াতে চাইছেন বলুন। আমি নিতান্ত ছাপোষা মানুষ। বিশ্বাস না হয়, কলকাতায় আমার বাড়ি এসে নিঃসন্দেহ হয়ে যাবেন।

তাঁর কথার মানে আমি বুঝতে পারি নি। কিন্তু বোঝবার জন্যে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। আর এক ভদ্রলোক বললেন: কী হচ্ছে অনাদিবাবু?

অনাদিবাবু প্রায় কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললেন: একটুখানি চা খেয়ে কী বিপদে পড়েছি বলুন। একেবারে ধনে প্রাণে মারা গেলাম। উনি মামলার তদন্ত করতে এসেছেন জানলে কি আমি চায়ের লোভে ওঁর ঘরে ঢুকি!

অনাদিবাবুর কথা শুনে আমি হেসে ফেললাম। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, অপর ব্যক্তিও আমাকে গোয়েন্দা বলে সন্দেহ করছেন। বললেন: আপনার সঙ্গে দু-একটা কথা আছে।

বললাম: আজ কি না বললে নয়?

ভদ্রলোক বললেন: আপনারই প্রয়োজনের কথা। এক দিনেই অনেকটা এগিয়ে যেতে পারবেন।

আপনার নাম?

এই ফ্যাসাদ। একটা ধরে নিন না কিছু।

পরম শ্রদ্ধার চোখে অনাদিবাবু বললেন: আপনি তো বেশ চালাক লোক যদুবাবু, নিজের নামটা কায়দা করে এড়িয়ে গেলেন।

যদুবাবু চটে উঠলেন: আপনি আবার এখানে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

বলেই তিনি নম্বর ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়লেন। বললেন : অনর্থক এ হোটেলে আপনি সময় নষ্ট করবেন না। এখানে একজনও খারাপ লোক নেই।

গম্ভীর ভাবে বললাম : ঐ মেয়েটার খোঁজ কার কাছে পাব ?

মায়ার ?

না, কল্যাণীর।

কল্যাণী বলে কেউ নেই মশাই। মায়ার খবর যদি চান তো পাশের হোটেলে গিয়ে উঠুন।

নির্মল সেনের খবর বুঝি আপনারা দেবেন না ?

বিপদের কথা। সে ভদ্রলোক তো কারও সঙ্গেই মিশতেন না। যাঁর সঙ্গে মিশতেন, তিনি এতক্ষণে শিলিগুড়ি পৌঁছে গেছেন।

খুব সাহস দেখছি আপনাদের। এক নিরীহ ভদ্রলোককে পুলিসে ধরে নিয়ে গেল, আর আপনারা সবাই মজা দেখছেন।

মজা দেখছি কি মশাই !

মজাই তো দেখছেন। কেন তাকে ধরে নিয়ে গেল কেউ জিজ্ঞেস করেছেন ? কেউ বলেছেন যে এমন ভালমানুষ ভদ্রলোক কখনও খুন করতে পারে না ?

আমি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু কল্যাণী চৌধুরী আমাকে রক্ষা করলেন, বললেন : হোটেলে আর নয় সঞ্জয়বাবু, আপনার মাথা খারাপ হয়ে যাবে। তার চেয়ে আসুন একটু বেড়িয়ে আসি।

এই প্রস্তাবটি আমার ভাল লাগল, বললুম : চলুন।

পাশ দিয়ে যাবার সময় অনাদিবাবুকে কল্যাণী ভয় দেখালেন, বললেন : যা জানি সব বলে দেব, সবাইকে ধরিয়ে দেব।

ভয়ে অনাদিবাবু আড়ষ্ট হয়ে রইলেন, কোন কথা কইতে পারলেন না।

পাঁচ

পথে নেমে ভারি ভাল লাগল। মেঘে বুঝি উত্তাপ আছে। দেহ যত আড়ষ্ট হবে ভেবেছিলাম, তা হল না। এক রকম উপভোগ্য আমেজে মন প্রফুল্ল হয়ে উঠল।

কল্যাণী চৌধুরী আমার পাশে পাশে চলছিলেন। তিনিও ওভারকোট পরে বার হন নি। আমার মতোই একখানা শাল জড়িয়েছেন। লক্ষ্য করে দেখলাম যে তাঁর শালখানা আধুনিক মেয়েদের মতো এক টুকরো কাপড় নয়, এক কাঁধ থেকে আর এক কাঁধে তুলতেই ফুরিয়ে যায় নি। একখানা প্রমাণ মাপের শাল ভাঁজ করে গায়ে জড়িয়েছেন। শৌখিনতার চেয়ে শালীনতার দিকে তাঁর বেশি নজর দেখলাম। আরও একটা জিনিস নজর এড়ায় না। তাঁর শালখানা একালের নয়, পুরনো আমলের। হাল্কা তুসের জমির উপর জামেয়ারের মতো সূক্ষ্ম কাজ করা। জিনিসটা যে বনেদী সে বিষয়ে আমার সন্দেহ রইল না। কল্যাণী চৌধুরীর চলনেও একটু বনেদীআনা দেখলাম।

সমতল পথ ছেড়ে কখন আমরা উপরে উঠতে শুরু করেছি খেয়াল করি নি। গতি আমাদের মন্থর হয়ে গেছে। কল্যাণী বললেন ঃ আজ আর বেশি দূর যাব না—বলে একখানা বেঞ্চির ওপর বসল।

হেসে বললাম ঃ আজ আমার নিজের কোন মত নেই।

আমার আছে। একজন ক্লান্ত মানুষকে জোর করে টেনে বার করেছি, সে কথা ভুলে গেলে তো চলবে না।

বাইরে এনে তো আমাকে আপনি রক্ষা করেছেন। আরও সোজা কথায়, আমাকে রক্ষা করবার জন্যেই আপনি টেনে এনেছেন।

তার জন্যে আমিও সমান ভাবে দায়ী। নিজের প্রসঙ্গ নিয়ে যখন আপনার কাছে গিয়েছিলাম, তখন ভাবি নি যে সবাই মিলে আপনাকে আক্রমণ করবে।

খানিকটা পথ নিঃশব্দে অতিক্রম করবার পর কল্যাণী বললেন : শুধু আপনার চেহারায় নয়, হাবেভাবেও আমি একটা আভিজাত্যের পরিচয় পেয়েছি। মনে হয়েছে, আপনার কাছে অনেক গোপন কথা আমি অসঙ্কোচে বলতে পারব।

কিন্তু কিছুই বলেন নি।

যা বলেছি তা কি কম ? পথ চলতে অনেক পদক্ষেপ ভুল হয়, ভুল জায়গায় পড়ে। সে কথা অতি সঙ্গোপনে রাখবার জিনিস। আমার জীবনের সব চেয়ে বড় কলঙ্কের কথা আমি অসঙ্কোচে আপনাকে বলে ফেলেছি।

লজ্জা পাবার মতো তো আপনি কিছু করেন নি।

করেছি। কিন্তু ভাগ্য আমাকে সাহায্য করেছে, পালিয়ে আমি আত্মরক্ষা করতে পেরেছিলাম। আজ আমার জীবনের যে জ্বালা, তার বিষটুকু আমি সেইখান থেকেই সংগ্রহ করে এনেছি। এ সব কথা বলবার সময় নিজেকে আমি হারিয়ে ফেলি। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।

আমার মনে হল, দীর্ঘ দিন কল্যাণী চৌধুরী নিঃসঙ্গ আছেন। অনেক কথা তাঁর বুকের ভিতর পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। পরিচিত কারও কাছে তা প্রকাশ করতে না পেরে ভিতরটা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। বললাম : আমিও আপনার মতো নিঃসঙ্গ। বলার কথা বলতে না পেরে লিখে রাখবার সংকল্প নিয়ে এসেছি।

আমি যে লিখতে পারি নে।

আমারও তাই মনে হয়েছিল।

কিন্তু আপনার লেখায় আমি মুন্‌শীয়ানা দেখেছি। অপরাধীর মন

আপনি খুব স্বচ্ছভাবে দেখতে পান। কিন্তু আমি পাই নে। মানুষ চিনতেই আমার ভুল হয়ে যায়।

অপরাধীর নাম শুনলে আমার কী ইচ্ছে হয় জানেন? ইচ্ছে হয় তার গলা টিপে দিতে। শ্বাস বন্ধ হয়ে সে মরুক, ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়ে তাকে মারা হোক। যত অন্যায় যত অনাচার সে করেছে, তার উপযুক্ত শাস্তি তার হোক। আমি তাই সহজ ভাবে কিছু লিখতে পারি নে, যা লিখি তা মিথ্যে।

কিন্তু আপনি তো নির্মল সেনকে সাহায্য করার কথা বলছিলেন?

কল্যাণী চৌধুরীকে আমি সতর্ক করে দিলাম। জনবহুল প্রশস্ত রাজপথ দিয়ে আমরা চলেছি। কোন খুনের আসামীর নাম করা আমাদের অনুচিত হবে। বাতাসেরও কান আছে।

কল্যাণী তখনি মেনে নিলেন। বললেন: সত্যি কথা। আমি একটুতেই আজকাল উত্তেজিত হয়ে উঠছি। গত কয়েক দিন আমি ঘর থেকে বার হই নি। কেন বার হই নি জানেন?

জানি না।

কয়েক দিন থেকে একটা মেয়ে যাতায়াত করছিল। তাকে আমি বার্চ হিলে প্রথম দেখি। প্রথম থেকেই আমি তাকে সন্দেহের চোখে দেখেছি।

কথায় কথায় ম্যলে আমরা পৌঁছে গেলাম। কল্যাণী একবার চারিদিকে চেয়ে বললেন: ঐ ধারে চলুন, ঐ ধারটা নির্জন আছে। ঠাণ্ডা হাওয়া একটু বেশি আসবে। আপনার কি শীত করছে?

শীত আমার করছে না, করলে গায়ের চাদরটা আরও ভাল করে জড়িয়ে নিতে পারব।

সেই ভাল। নির্জনে বসলে আমি একটু হাল্কা হতে পারব।

ম্যলের মাঝখান দিয়ে আমরা অন্য ধারে চলে গেলাম। বড় বড়

দোকানে সব বাতি জ্বলে উঠেছে। নানা রঙের মেয়ে পুরুষে মাঝখানটা ভরে আছে। যত সৌরভ তত ফুল নেই, যত রঙ তত রূপ নেই, যত কোলাহল তত গান নেই। কোন দিকে না তাকিয়ে আমরা একটা খালি বেঞ্চিতে গিয়ে বসলাম। কল্যাণী চৌধুরী নিজের চারি ধারটা আবার দেখে শালখানা জড়িয়ে বসলেন।

আস্তে আস্তে আমি বললাম : আপনি মায়ার কথা বলছিলেন।

আপনার মনের ওপর ভার পড়ছে না তো?

একটুও না।

আপনি বোধ হয় আশ্চর্য হবেন, নির্মল সেন আমাকে চিনতে পারে নি, সন্দেহও করে নি এতটুকু। অথচ একবার দেখেই আমি তাকে চিনতে পেরেছিলাম। মনোজ মিত্রের সঙ্গে তাকে অনেক বার দেখেছি। দু জনেই প্রচুর মদ খেত, আকণ্ঠ খেত। শুনেছি, বাজি রেখে খেত। মনোজ মিত্র নাকি কোন দিন হেরে যায় নি। নির্মল সেন গড়িয়ে পড়ে গেলে গাড়িতে তুলে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে।

কল্যাণী চৌধুরী হঠাৎ বলে উঠলেন : সে সব নোংরামির কথা থাক। আমি বরং মায়ার কথা বলি।

মায়ার গল্প আমি কল্যাণীর মুখে শুনলাম। পাশের হোটেল থেকে আমাদের হোটেলে উঠে এসে কল্যাণী নির্মল সেনকে দেখলেন। কিন্তু নিজের পরিচয় দেবার চেষ্টা করলেন না। সেটা ঘৃণায় নয় ; ভয়ে। তার আগেই খবরের কাগজে বেরিয়েছিল যে অপদার্থ সংঘের সমস্ত অপদার্থের নাম পুলিস সংগ্রহ করেছে এবং একে একে অনেককেই ধরপাকড় করছে। কল্যাণী তাই লুকিয়ে থাকাই সঙ্গত মনে করলেন।

মায়াকে প্রথম দেখলেন বার্চ হিলে। সে দিন তিনি বিকেল বেলাতেই দূরের পথে বেরিয়েছিলেন। ওঠানামা কম বলে বার্চ হিল তাঁর ভাল লাগে। বসবার জায়গা আছে, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা খেলা করে।

বসে বসে খেলা দেখতে মন্দ লাগে না। কল্যাণী ছেলে মেয়েদের খেলা দেখছিলেন।

নির্মল সেন কখন এসে আর একটা বেঞ্চে বসেছিল, কল্যাণী তা খেয়াল করেন নি। খেয়াল করলেন মায়াদের লোভী দৃষ্টি দেখে সাদা গোঁফদাড়িওয়ালা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে মায়া বাগানে আসছিল। মায়া চোখের ইশারায় নির্মলকে দেখিয়ে দিল। বৃদ্ধের চোখে আমি শ্যেন দৃষ্টি দেখলাম। ঐ বৃদ্ধকে সবাই মায়ার বাবা মনে করেন।

কল্যাণী বললেন : এই সামান্য ঘটনার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে বলে আমি মনে করি। মায়ার সঙ্গে নির্মলের সম্বন্ধ যদি প্রীতির হবে, তাহলে এই ঘটনাটি মিথ্যা হওয়া উচিত। কোন কুমারী মেয়ে চোখের ইশারায় তার বাপের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না তারই নায়কের প্রতি। আর বৃদ্ধ বাপের চোখেই বা আমি শ্যেনের দৃষ্টি কেন দেখব!

এই মন্তব্য করে আপনি ভাল করলেন না। আমার মনেও খটকা লেগে গেল।

তার পরের ঘটনা আপনার খটকাকে সমর্থন করবে। মায়া তার বাপের সঙ্গে পাশাপাশি বসে নির্মলকে লক্ষ্য করতে লাগল। নিজেদের মধ্যে যা বলাবলি করেছে, তা শুনতে পাই নি সত্য, কিন্তু সে যে কোন চক্রান্তের মতো জটিল, তাতে আমার সন্দেহ ছিল না। প্রথমে বুড়ো উঠে গিয়ে নির্মলের সঙ্গে কথা কইলেন, তারপর মেয়েকে ডেকে নিলেন।

গোড়া থেকেই নির্মলকে খুব গম্ভীর দেখাচ্ছিল, এরা কাছে যাবার পরেও কিছু হাল্কা হতে পারল না। মনে হচ্ছিল, ওদের সঙ্গ সে পছন্দ করছে না, শুধুমাত্র ভদ্রতার খাতিরে সহ্য করতে বাধ্য হচ্ছে।

অপদার্থ সংঘে কখনও তাকে গম্ভীর হতে দেখা যায় নি। তার মতো প্রাণবন্ত মানুষ সেখানে কম ছিল। সবারই প্রাণ ছিল, প্রাণ না থাকলে কেউ অপদার্থ সংঘে আসত না। ধীরে ধীরে বোঝা যাচ্ছিল যে

সাহিত্য দর্শন রাজনীতি বা সমাজনীতি এই সংঘের উদ্দেশ্য নয়, এর উদ্দেশ্য একেবারে পার্থিব বিলাস। একজন বয়ঃবৃদ্ধ ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে সংঘ ছাড়বার সময় বলে গেলেন, যত সব অপদার্থ, অপদার্থ সংঘ। যাঁরা রইলেন, তাঁরা রাতারাতি ঐ নামটা গ্রহণ করে নিলেন। মনোজ মিত্র বলল, এর চেয়ে যোগ্যতর নাম আমাদের হতে পারে না। সেই দিন থেকেই তারা পরস্পরকে সম্বোধন করতে লাগল অপদার্থ বলে।

কল্যাণী চৌধুরী বললেন ঃ মানুষ দিনে দিনে এত হাল্কা হয়ে যাবে, এ কথা ভাবতে আমার কষ্ট হয়। তবু আমি আরও কিছু দিন সেখানে ছিলাম। আমি দেখছিলাম এই দেশের মাটিতে একটা সম্পূর্ণ নূতন সমাজ জেগে উঠছে। বিভিন্ন স্তরে তারই বিচিত্র রূপ। এ দেশের মাটির সঙ্গে এ সমাজের যোগ নেই, যোগ নেই এ দেশের আধ্যাত্মিক চেতনার সঙ্গে। জাপানীরা বুঝি আকাশ থেকে বোমার সঙ্গে এক ঝাঁক মানুষ ফেলে দিয়ে গেছে, কিংবা আমেরিকা এ দেশ রক্ষা করতে এসে তাদের মানুষগুলোকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় নি।

যুদ্ধের এটা অনিবার্য ফল।

আমি তা স্বীকার করি না। পঁচিশ বছর আগে নাকি আরও একটা বড় যুদ্ধ হয়েছিল। আরও ভয়াবহ। অভাবে অভিযোগে এ দেশ জর্জরিত হয়েছে, কিন্তু দেশের মানুষ মনুষ্যত্ব হারায় নি। এবারের যুদ্ধ শুধু মনুষ্যত্বটুকু কেড়ে নিয়ে গেছে।

আমার মনে হল, কল্যাণী চৌধুরীর আর একটা রূপ ছিল, সে রূপ একটা বিরাট আঘাত পেয়ে বদলে গেছে। পারিবারিক জীবনের কোন বিচিত্র ঘটনা এই মেয়েটির জীবনে বিক্ষোভ এনেছে, হয়তো কোন বিপর্যয় দেখেছে। সেই তিক্ত অভিজ্ঞতায় আজও তার মন আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাকে আরাম দেবার জন্য বললাম ঃ দেশ স্বাধীন হয়েছে, আমাদের আর দুঃখ থাকবে না।

দুঃখ বাড়বে। নতুন জাত মাটিতে শেকড় গেড়েছে, গাছ এবার ফুলে ফলে ভরে উঠবে। বিষবৃক্ষ হবে।

আমি আর প্রতিবাদ করলাম না, জিজ্ঞাসা করলাম: মায়ার কী হল ?

লজ্জিত হয়ে কল্যাণী চৌধুরী আবার মায়ার গল্প শুরু করলেন।

মেয়েটি সুশ্রী, বোধ হয় ফর্সাও। কিন্তু প্রসাধনের রঙে তার স্বাভাবিক রঙ ঢাকা পড়েছে। রঙ মেখে মন ভোলাবার চেষ্টা এ দেশে নতুন শুরু হয়েছে। চোখে একটু কাজল কিংবা ঠোঁটে পানের রঙ মন্দ লাগে না। কিন্তু কামানো ভ্রূ এখনও অনেকে সইতে পারেন না। মায়ার ভ্রূ সবটুকু কামানো নয়, উপর নিচে খানিকটা কামিয়ে সরু করে নিয়েছে।

আপনি ভাবছেন, প্রসাধন সম্বন্ধে আমি খুব সচেতন। কিন্তু এ কথা ভাবলে আপনি ভুল করবেন। মায়াকে আমি নানা কারণে লক্ষ্য করেছি। তাকে লক্ষ্য করা উচিত হবে বলে আমি মনে করেছিলাম। আপনাকে আমি বলেছি যে নির্মল সেনকে আমি চিনতে পেরেছিলাম, কিন্তু তার স্বভাবের আমূল পরিবর্তন দেখে আমার বিস্ময় বোধ হচ্ছিল। খবরের কাগজের একটা সংবাদ পড়ে মানুষের পরিবর্তন হয় না, কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মৃত্যুসংবাদ পেলে মানুষ ছুটে যায়। বার্চ হিলের বেঞ্চে বসে দার্শনিকের মতো এমন আকাশপাতাল ভাবে না! অপদার্থ সংঘের যতটুকু আমি দেখেছি, তাতে এই রকমের একটা পরিণাম আমি অবশ্যম্ভাবী বলে মনে করেছি। তাইতেই আমি মনোজ মিত্রের হত্যার সঙ্গে নির্মল সেনের একটা যোগাযোগ আশংকা করে গোড়া থেকেই সতর্ক ছিলাম।

মনোজ মিত্র যে খুন হবে, এ কথা আপনি জানতেন ?

এ একটা সত্য কথা। বিষ খেলে ভেতরটা জ্বলে গিয়ে মৃত্যু হবে,

এই রকমের একটা সত্য। প্রথমে কে মরবে, মনোজ মিত্র না নির্মল সেন, না আর কেউ, তা অবশ্য জানা ছিল না। ওদের সংঘে যখন আমি যোগ দিই, তখনকার কথা বলেছি। মহেশবাবু বেরিয়ে গেলেন, তাঁর সঙ্গে আরও অনেকে গেলেন। আমি আরও কিছু দেখবার ও জানবার অপেক্ষায় সংঘে রয়ে গেলাম।

না না, আমি আপনার কাছে সত্যি কথাই বলব। অকপটে সমস্ত স্বীকার করেই আমি আপনার সাহায্য চাইব। মনোজ মিত্র আমার হাত ধরে আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে বলেছিল: জীবনটাকে নষ্ট করছ কেন?

প্রচণ্ড দাবী। কিন্তু সে দিন আমি আত্মসমর্পণ করি নি। শুধু বুঝে ফেললাম যে এতদিন আমি পুরুষ দেখি নি। জগতের একমাত্র পুরুষকে আমি যেন প্রথম দেখলাম। সে দাবী জানাতে জানে, বোধ হয় কেড়ে নিতেও জানে। সংঘের ভবন থেকে আমি পালিয়ে গেলাম, স্থির করলাম যে আর কখনও সেখানে যাব না। হয়তো যেতাম না। যুক্তি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে বেদনা দিয়েও আমি আত্মসংবরণ করতে পারতাম। কিন্তু মনোজ মিত্র খুঁজে খুঁজে বাড়ি এসে আমায় টেনে নিয়ে গেল। বলল: আর কত দিন লুকিয়ে থাকবে?

লুকিয়ে থাকবার বাসনা আমার ছিল না। ছিল ভয়। আমার পঁচিশ বছরের যৌবন যে লোকটা নাড়া দিতে পারে এমন নির্মম ভাবে, তাকে ভয় করে বই কি! কিছুই যে তার জানি নে। তার শক্তির উৎসে আছে প্রেম, না কামনা? সহজে আমি তাই ধরা দিতে পারলাম না।

নির্মল সেন আমাকে এক গ্লাস মদ এগিয়ে দিয়েছিল। আমি ছুঁই নি। মনোজ মিত্র তাকে ধমকে দিয়েছিল। বলেছিল, ভদ্রতা শেখ। বস্তি থেকে এঁকে আমি কুড়িয়ে আনি নি।

এই ভর্ৎসনা শুনে মনোজকে আমি ভালবেসেছিলাম। কিন্তু পরে জানলাম, আমি ভুল করেছি। আমার মতো ভুল আরও অনেকে করেছে। এক বিবাহিত মহিলা আমার চোখ খুলে দিয়েছিলেন। এই কৃতজ্ঞতার ঋণ আমার শোধ করা হয় নি।

কেন ?

তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন।

তাঁর নাম আপনার মনে আছে ?

জেনে নেবার সুযোগ পাই নি।

তারিখটা মনে আছে ?

১৯৪৫ সনের ডিসেম্বর মাস।

পঁচিশে নয় তো !

কল্যাণী চৌধুরী গভীর ভাবে আমার মুখের দিকে তাকালেন। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে কিছু আবিষ্কারের চেষ্টা করছেন মনে হল। বললাম : আমার স্ত্রী সে দিন আত্মহত্যা করেছিলেন।

কল্যাণী কি এই কথারই অপেক্ষা করছিলেন ! তবু যেন স্তব্ধ হয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত মুখে তাঁর কথা যোগাল না।

ছয়

কল্যাণী চৌধুরীকে আমি জাগিয়ে দিলাম। বললাম ঃ আপনি অনেকক্ষণ কথা কইছেন না।

আপনার কাছে আমি হেরে গিয়েছি যে!

কল্যাণীর দৃষ্টি বড় বেদনার্ত দেখাল, বড় অন্তরঙ্গ। বললাম ঃ সে কি!

কল্যাণী বললেন ঃ আমার মনে পড়ছে, আমি এক দিন আপনাকে সংঘের ভবনে দেখতে পেয়েছিলাম।

ঠিকই দেখেছেন। আমার স্ত্রীর মৃত্যুর পর আমি এক দিন সেখানে গিয়েছিলাম।

আমাকে দেখেছিলেন?

মনে পড়ে না। অনেক মেয়ের ভিড়ে আপনি বোধ হয় হারিয়ে গিয়েছিলেন।

এ কথার পরে কল্যাণী আর কিছু জানতে চাইলেন না। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আমাকে চিনলেন কী করে?

সবাই বললে, সেই আত্মহত্যার ব্যাপার নিয়ে অনুসন্ধান করতে এসেছেন। কিন্তু মহিলা কেন আত্মহত্যা করেছেন তা কেউ বলল না।

আমার মনে হল, কল্যাণী এবারে আমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করবেন। কিন্তু প্রশ্ন করলে কী উত্তর দেব! সে রহস্য তো আজও অনাবিষ্কৃত থেকে গেছে। শুধু কৌতূহল নিরসন হয়েছে যুগের ধর্ম দেখে।

আইন পাস করে তখন আমি আদালতে যাতায়াত করছি। দেওয়ানি মামলা করি। আত্মীয় বন্ধুরা আমার মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা

দেখে উৎসাহিত হচ্ছেন। সে আমার নিজের যোগ্যতা দেখে, না পিতার প্রতিপত্তির কথা জেনে, তা বলা শক্ত। বিলাতে ব্যারিস্টারি পড়ার কথা ছিল, কিন্তু বিশ্বের বর্তমান অবস্থায় তা আর সম্ভব নয়। ইয়োরোপে যুদ্ধ চলছে। বোমা পড়ছে বিলেতের উপর। নিজেদের দেশেও স্বাধীনতার স্বপ্ন মনে প্রাণে গুমরে উঠছে। নেতাজী কী করবেন জানা নেই, কিন্তু বাংলা দেশ তাঁর আহ্বানের জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। কাজেই দেশ ছেড়ে বিদেশে আমার যাওয়া চলে না। চাকরির চেষ্টা না করে আদালতে যোগ দিলাম।

এই সময় পৃথিবীর রঙ বদলাচ্ছে। মানুষেরও রঙ বদলাচ্ছে। পুরনো ধ্যানধারণা রীতিনীতি সমাজ ও ধর্ম দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। পৃথিবীর প্রয়োজনের নামে স্বার্থের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে দৃঢ় মূলে। উনিশ শো বিয়াল্লিশের বিপ্লব সফল হল না। নেতাজী নাকি দেশের মাটিতে পৌঁছেছিলেন মুক্তির বার্তা নিয়ে, নেতারা সে কথা বিশ্বাস করেন নি। আমরা যখন আনন্দে সংশয়ে তাঁর নির্দেশের অপেক্ষা করছি, তখনই সব শেষ হয়ে গেল। নেতাজী নেই বলে আমাদের নিশ্চিন্ত করে দেওয়া হল। এ সব রাজনীতির কথা। রাজনীতি জানার অহংকার আমার ছিল না। আমি ভাবলাম যে সেই আঘাতে বাংলা দেশের মেরুদণ্ড ভেঙে গেল। মেরুদণ্ড ভাঙল আমাদের গোটা দেশের। স্বাধীনতা হয়তো এক দিন আসবে কিন্তু সে স্বাধীনতা সমাজের মুক্তি আনবে না। কুড়িয়ে পাওয়া স্বাধীনতায় যে মুক্তির আস্বাদ নেই। নাগপাশের মতো বিষাক্ত বন্ধনে দেশ আর্তনাদ করবে।

আমি যে পরিবারে মানুষ হয়েছি, সেই পরিবারের একটা আভিজাত্যের গর্ব ছিল। সে শুধু পয়সার নয়, পাণ্ডিত্যেরও। আমি তা ভুলে থাকবার চেষ্টা করি। কথায় ও ব্যবহারে যাতে কিছু প্রকাশ না পায়, তার জন্য সর্বদা সতর্ক থাকি। শৈশবে মায়ের কাছে আমি এই শিক্ষাই

পেয়েছিলাম। পিতা যে আমাকে অন্য রকমের শিক্ষা দিয়েছিলেন, তা নয়। তবে মাঝে মাঝে আমার মনে হয়েছে যে সরকারী চাকরির পদগৌরব তাঁকে জনতার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে। অর্থের কৌলিন্য অন্তরায় হচ্ছে সাধারণ মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তায়। তাঁর ভুল হয় না বলে একটা অহংকার ছিল। কিন্তু আমার বিবাহের ব্যাপারেই বোধ হয় তাঁর প্রথম ভুল হল।

মা তখন বেঁচে ছিলেন না। কিন্তু তিনি যে উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন, তা আমার মনে ছিল। তিনি বলেছিলেন, আমাদের ছোট সংসার, তাই যে কোন মেয়েই হয়তো মানাবে। অন্ততঃ আমরা মানিয়ে নিতে পারব। কিন্তু সংসার বড় হলে পুরনো ঘরের মেয়ে আনা খুবই দরকার। তারা ঘর ভাঙতে ভয় পায়, বরং ভাঙা ঘর জোড়া দেবার চেষ্টা করে। আমার মা বেঁচে থাকলে নতুন ঘরের মেয়ে তিনি কিছুতেই আনতেন না।

শীলা নতুন ঘরেরই মেয়ে ছিল, উঠতি ঘরের। ওর বাবার ইঁটের ভাঁটি ছিল গঙ্গার ধারে। যখন লড়াই লাগল, তখন আসামে গেলেন সড়ক তৈরি করতে। তারপর এখানে সেখানে সৈন্যদের ব্যারাক তৈরি করে কলকাতা সহরে নিজের ম্যানসন তুললেন। মেয়ের বিয়ে যে আরও শাঁসালো ঘরে দিতে পারতেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সময়ের অভাবেই বেশি সময় নষ্ট না করে আমার সঙ্গেই শীলার বিয়ে দিয়ে দিলেন। বড়লোকের মেয়ে বাবা খুশী মনেই নিয়েছিলেন। বিয়েটা তাঁর ইচ্ছাতেই হয়েছিল। সেকেলে ছেলের মতো আমি নিজের ভাগ্যকে তাঁরই হাতে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। পরে বাবা স্বীকার করেছিলেন যে তাঁর হিসেবের ভুল হয়েছিল। কিন্তু বেশি দিন তাঁকে সেই ভুলের মাশুল দিতে হয় নি। একদিন সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করে অসম্মানের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলেন। শীলাকে আত্মহত্যা করতে

তিনি দেখে যান নি। তাঁকেও আত্মহত্যা করতে হয় নি বলে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি।

কল্যাণী বললেন: আপনার পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে আমি আপনাকে বিব্রত করব না।

বিব্রত আমি হব না, কিন্তু—

কিন্তু কী?

আপনি আমাকে অনেক কিছু অসংকোচে বলেছেন। সে কি শুধু আইনের সাহায্য পাবার আশাতেই বলেছেন?

তার জন্যে সংক্ষেপে বলা যেত।

সত্যি কথা। তবে কেন কল্যাণী চৌধুরী আমাকে এত কথা অসংকোচে বলে এমন বিপদে ফেলেছেন। বছর তিনেক হল আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ের ভিতর এ প্রসঙ্গ আমাকে উত্থাপন করতে হয় নি। যারা কৌতূহলী হয়ে কিছু জানতে এসেছিল, তাদের আমি ফিরিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আজ তো কল্যাণীর কাছে কিছু গোপন করতে ইচ্ছা করছে না।

কল্যাণী বললেন: কী ভাবছেন?

ভাবছি আপনার কথা।

কল্যাণী হাসলেন। সুন্দর সরল নিরভিমান হাসি। এই হাসি দেখে আমি মুগ্ধ হলাম। আমার মনে হল, কল্যাণী এক সময় হাসতে জানতেন, এই রকম সুন্দর হাসি তাঁর মুখে সারাক্ষণ লেগে থাকত। হাসির সঙ্গে তাঁর মুখে প্রাণের যোগ ছিল, প্রাণের সজীবতা হাসি হয়ে ঝরে পড়ত। মনে হল, আজ অনেক দিন পরে কল্যাণী চৌধুরী আবার হাসলেন। তাড়াতাড়ি বললাম: হাসলেন যে?

কল্যাণী বললেন: সরলতা আমরা একেবারে হারিয়ে ফেলেছি। এর জন্যে বোধ হয় শিক্ষা ও সভ্যতাই দায়ী। আমরা যদি বন্য হতাম,

আপনার মনে এত সঙ্কোচ হত না। নিজের কথাও সহজে বলতেন, আর আমি কী করে বললাম সে চিন্তাতেও এত ক্লেশ পেতেন না।

বন্য জীবনের প্রতি কল্যাণীর কি শ্রদ্ধা আছে! কিন্তু আমি সে কথা জিজ্ঞাসা করবার সাহস পেলাম না।

কল্যাণী বললেনঃ আপনাকে দেখে আমার একটা কথা মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল, আপনি একজন আঘাত-পাওয়া মানুষ। কেন এ কথা মনে হয়েছিল তাও বলি। একটা খুনের খবর পেয়ে আপনি কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না, কৌতূহলীও হলেন না। আপনি একজন উকিল, আপনার প্রাণে সাড়া না জাগাক, আপনার বুদ্ধিকে নাড়া দেবেই। কিন্তু আপনার কথাবার্তায়, আপনার আচরণে কোন পরিবর্তনই ফুটে উঠল না। আমি আড়াল থেকে আপনাকে দেখছিলাম। বুঝতে আমার দেরি হল না যে এর চেয়েও কোন গভীর দুর্ঘটনা আপনার প্রাণকে পাথর করেছে। আমি ঠিক এই রকমেরই একজন মানুষকে খুঁজছিলাম, আঘাত-পাওয়া মানুষ যে মানুষের বেদনা বুঝবে নিজের বেদনা দিয়ে।

আমি বিহ্বল হয়ে যাই। কল্যাণী কী আমাকে জাদু করছেন! আমার চেতনার কেন রূপান্তর হচ্ছে!

কল্যাণী বললেনঃ আপনাকে বোধ হয় আমি চিনতেও পেরেছিলাম। আপনি যখন ম্যানেজারের সঙ্গে কথা কইছিলেন, আমি ভাবছিলাম আপনাকে কোথায় দেখেছি। তারপর সেই মহিলার আত্মহত্যার কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল, সেই ঘটনার পরেই বোধ হয় আপনাকে প্রথম দেখেছি, সেই শেষ। তারপরে আমিও আর সংঘে যাই নি। কলকাতা থেকে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করছি।

আমি বুঝতে পারছিলাম, আমার দৃঢ়তা ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ছে। ভেঙে পড়ুক, ভেঙে পড়ে বলেই তো সে হৃদয়। হৃদয়ের ধর্ম কেন যুক্তি

দিয়ে খর্ব করি! বললাম: আপনি আমাকে ঠিকই চিনেছিলেন। শীলার আত্মহত্যার পরে আমি এক দিন সংঘের ভবনে গিয়েছিলাম। তার আগে অপদার্থ সংঘের নাম আমি শুনি নি। এ রকম একটা নামের সংঘে যাতায়াত করতে আমার নিশ্চয়ই লজ্জা করত। নামটা অন্য কিছু হলে আমি হয়ত আরও কয়েক দিন যেতাম। গেলে আর কিছু না হোক, খানিকটা রহস্য ভেদ হত।

আমাদের মনে হয়েছে, রহস্য ভেদ করবার বাসনা আপনার ছিল না।

বাসনা ছিল, কিন্তু প্রবৃত্তি ছিল না। আরও সত্য কথা, আমার আভিজাত্যের অহঙ্কার একটা মস্ত বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শক্ত মাটির মানুষ হয়ে নোংরা পাঁক ঘাঁটতে মন আমার কিছুতেই রাজী হল না।

কিন্তু তিনি তো আপনার স্ত্রী ছিলেন!

তাতে কোন সন্দেহ নেই, আমার কিছু কর্তব্যও ছিল মানি। কিন্তু সে কর্তব্য আমি যদি তার মৃত্যুর আগে পালন করতাম, তাহলে হয়ত এ দুর্ঘটনা ঘটত না।

কল্যাণী চৌধুরী শিউরে উঠলেন। শীতার্ত বাতাস বইছিল অল্প অল্প। দিনের আলো নিভে গিয়ে পথের উপর অন্ধকার ঘনিয়েছে। পাহাড়ের অন্ধকারে ঠাণ্ডা আছে। কিন্তু কল্যাণী যে শীতে শিউরে উঠলেন না, তা আমি বুঝতে পেরেছি। গায়ের শালখানা তিনি ভাল করে জড়ালেন না, শুধু একটু আড়ষ্ট হয়ে বসলেন।

বললাম: ভয় পাবেন না। আমি তাঁর মৃত্যুর কারণ নই, আমি সতর্ক থাকলে হয়তো তাঁকে রক্ষা করতে পারতাম।

পারতেন?

এমন করে প্রশ্ন করবেন না। তাঁকে রক্ষা করবার কোন সুযোগ

পাই নি বলেই আমার আক্ষেপ হয়েছিল। আমার অসতর্কতার জন্য নিজেকে ধিক্কারও দিয়েছিলাম। সব কথা জানলে আমি নিজেই তাঁকে হত্যা করতাম কিনা, তাও বলতে পারি না। সোজা কথায়, তাঁর আত্মহত্যা দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। আমার নিজের ঘরে যে এত বড় একটা ঘটনা ঘটতে পারে, স্বপ্নেও আমি তার আভাস পাই নি। এই আত্মহত্যার কারণ আমাকে গোয়েন্দার মতো অনুসন্ধান করতে হয়েছিল। কিন্তু আমার পিছনে গোয়েন্দা লাগে নি। শুনেছিলাম, শীলার বাবা কিছুই প্রকাশ হতে দেন নি। এমন কি কোন কাগজেও খবরটা প্রকাশ করা হয় নি। শুধু এক দিন আমাকে বলেছিলেন যে পাত্র নির্বাচনে তাঁর ভুল হয় নি, কিন্তু আমার ভুল হয়েছিল পৃথিবীটাকে চিনতে। প্রচুর লেখাপড়া করেও আমি নাকি অজ্ঞ থেকে গিয়েছি।

এ হল নতুন পৃথিবী সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতা। পিতা তাঁর কন্যাকে চিনেছিলেন এবং একটা বৃহৎ দুর্ঘটনা এড়াবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সে গোপনে। আমার কাছে কিছু প্রকাশ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। করলে অন্য রকম সমস্যা ঘনিয়ে উঠত। আমি যখন তাঁকে টেলিফোনে তাঁর কন্যার মৃত্যু সংবাদ দিই, তিনি একটুও বিচলিত হন নি। শুধু একটি কথা বলেছিলেন, আসছি। তারপর সমস্ত ব্যবস্থা তিনি একাই করেছিলেন।

শীলার বাবা আমার কাছে কিছুই জানতে চান নি। প্রথমটায় মনে হয়েছিল যে তিনি এমন গভীর ভাবে আমাকে অপরাধী সন্দেহ করছেন যে কোন প্রশ্ন করার প্রয়োজন মনে করেন নি। তারপর মনে হল যে তিনি এমন কোন দুর্ঘটনার সংবাদের জন্য অনেক আগে থেকেই অপেক্ষা করছিলেন। আমার কাছে তাঁর একটি কথা জানবার ছিল—এ রকম একটা পরিণতির আশঙ্কা আমি করেছিলাম কি না।

তাঁর ছেলেমেয়েদের কথা আমি পরে শুনেছিলাম। ছেলে বিলেতে

গিয়েছিল, সে ফেরে নি। খরচ পাঠানো বন্ধ করে তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন, তাতে ফল হয় নি। যখন তিনি আসামে পথ তৈরি করছিলেন, তখন তাঁর বড় মেয়ে নাকি হারিয়ে যায়। সেই মেয়ের কথা আমরা কোন দিন শুনি নি। ভদ্রলোক বিপত্নীক বলে পরিচিত। অত্যন্ত চাপা স্বভাবের মানুষ। তাইতেই তিনি জীবনের অনেক মর্মান্তিক ঘটনা গোপন রাখতে পেরেছিলেন।

বিয়ের সময় মেয়েকে তিনি বাড়ি গাড়ি কাঁচা পয়সা অনেক দিতে পারতেন। কিন্তু কিছুই দেন নি। বলেছিলেন, তোমাদের বাড়ি গাড়ি তো আছেই, পয়সারও অভাব নেই। আমি বরং কিছু কাগজ দিচ্ছি, বছর দশেকের আগে ভাঙানো চলবে না।

এ কথা শুনে তখন আমার কিছু মনে হয় নি। পরে বুঝেছিলাম যে তিনি দূরদর্শিতার কাজ করতে চেয়েছিলেন। আমি সেই কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছি। সাবেকি আমলের চকমেলানো বাড়ি শীলার ভাল লাগে নি। শুধু বাড়ির চেহারার জন্য নয়, নানা কারণেই ভাল লাগে নি। বাবা অবসর নিয়েছিলেন। সময় কাটাবার জন্য যে পথ বেছে নিলেন, তা প্রাচীন জনোচিত। পূজাপাঠ ও শাস্ত্রাধ্যয়ন। আমাদের ঠাকুর ঘর ছিল, তাতে শিব ছিলেন প্রতিষ্ঠিত। এত দিন পূজারী ব্রাহ্মণ পূজা করতেন, এবারে বাবা সেই ভার নিলেন। মার কথা আমার মনে পড়ে। শিবের পূজা না করে তিনি জলস্পর্শ করতেন না। সন্ধ্যা বেলায় শিবের আরতির পূর্বে তাঁকে কোন উৎসবে পাওয়া যেত না। শৈশবে আমি একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ঐ পাথরে মাথা ঠুকে তুমি কী পাও? মা বলে-ছিলেন, কী পাই নি বড় হয়ে তা ভেবে দেখিস। সবাই বলে, মা সব পেয়েছেন। স্বামী পুত্রকে রেখে যাওয়ার মতো বড় পাওয়া বুঝি আর নেই। তাইতেই বলেছিলেন, তুলসীতলা নয়, শিব মন্দিরের নিচে আমাকে নামাস। সেই তাঁর শেষ কথা।

আমাদের জীবনে এই প্রথম কথা। বিশ্বাসে কী না মেলে!

নিজেকে আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু কল্যাণী আমাকে থেই ধরিয়ে দিলেন। বললেন: আপনাদের সেকেলে বাড়ি আপনার স্ত্রীর ভাল লাগে নি।

বাবাকেও তার ভাল লাগে নি। ধূপ ধুনোয় তার দম আটকাত, শঙ্খ-ঘণ্টার ধ্বনিতে কান হত ঝালাপালা। আচার নিষ্ঠায় তার স্বাধীনতা ব্যাহত হত। এই ধারণা যে নিতান্তই মন গড়া, তাতে সন্দেহ নেই। শিবের মন্দিরে দেব সেবা হলে বা নির্জনে কেউ শাস্ত্র পাঠ করলে অপরের অসুবিধা কেন হবে! আমি এই অন্যায় আবদারের প্রতিবাদ করেছিলাম।

কল্যাণী চৌধুরীর দৃষ্টিতে আমি যেন আমার কাজের সমর্থন পেয়ে গেলাম। মনে হল, প্রতিবাদ না করে আমি যদি তার আবদারের প্রশ্রয় দিতাম, তাহলে সে আমাকে উপহাস করত, কিংবা ধিক্কার দিত। তবু আমি তার কাছে স্বীকার করলাম যে তার অন্য আবদারে আমি বাধা দিই নি। সে বেড়াতে ভালবাসত বলে আমি আদালতে পৌঁছে গাড়ি ফেরত পাঠিয়ে দিতাম। সন্ধ্যা বেলা যখন আমার মক্কেলরা আসত, তখনও আমি তাকে বেড়াবার অনুমতি দিতাম। আর দিতাম তার প্রয়োজনের মতো পয়সা। তাতে আমি কোন দিন কার্পণ্য করি নি।

আজ স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই, পিতার মৃত্যুর পরে আমি যা কিছু পেয়েছি, তাকে সব দিয়ে আমি নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলাম। কেন তার অর্থের প্রয়োজন, সে কথা কোন দিন জানতে চাই নি। কিন্তু তার দাবী মেটাবার জন্য আমি আপ্রাণ পরিশ্রম করেছি। কতটুকুই বা সময়! দু তিনটে বছরেই আমি নিঃস্ব হয়ে গেলাম। ব্যাঙ্কের পয়সার জন্য ক্ষোভ ছিল না। তার মৃত্যুতে আমি মনের ভরসা হারিয়ে রাতারাতি যেন বুড়ো হয়ে গেলাম।

কল্যাণী চৌধুরীর উজ্জ্বল দৃষ্টিতে এক জিজ্ঞাসা জ্বলজ্বল করছে। আমি তার প্রশ্ন জানি। বললাম: কেন দিলাম? দান মানুষের ধর্ম, কৃপণতা নয়। দিয়ে মানুষ কাঙাল হয় না। দেবার জিনিস কোন দিন ফুরিয়েও যায় না। শীলাকে যা দিয়েছি, তা নিতান্তই পার্থিব। অপার্থিব কিছুই সে নিতে পারে নি। তাকে এখন আমি করুণা করি।

এমন কাজ কেন তিনি করলেন, তা কি জানতে পেরেছিলেন?

কী হত জেনে! শুধু এইটুকু জানি যে দুঃখে মানুষ সংগ্রাম করে, আর আত্মহত্যা করে অনুশোচনায়। কোন কারণে তার মোহ ভঙ্গ হয়েছিল, এইটুকু জেনেই নিশ্চিন্ত হয়েছি। মোহের কারণ অনুসন্ধানে নিজের মনটা কলুষিত করি নি।

তারপর?

দুর্বলতার দিন আমার অতিক্রান্ত হয়েছে।

বাধা দিয়ে কল্যাণী বললেন: হয় নি। জীবনকে আপনি অন্য চোখে দেখছেন। যারা আপনার স্ত্রীর মৃত্যুর কারণ, তাদের আপনি আজও ক্ষমা করেন নি।

আমি বোধ হয় চমকে উঠেছিলাম।

কল্যাণী বললেন: চমকে উঠবেন না। আমি যে কথা বলছি, তা সত্য। মিথ্যা বলে সন্দেহ থাকলে এমন সহজে অভিযোগ করতাম না।

কল্যাণী কি ভুল বলছেন না! আমি কি আমার দুর্বলতা আজও অতিক্রম করতে পারি নি! ক্ষমা করতে পারি নি শীলার হত্যাকারীদের! কিন্তু কাউকে তো আমি চিনি না, কারও উপর তো আমার অভিযোগ নেই, প্রতিশোধ নেবার সংকল্প নেই কারও উপরে।

কল্যাণী বললেন: আপনার স্ত্রীর মৃত্যুর আগে আপনি দেওয়ানি আদালতের উকিল ছিলেন, তার পর যোগ দিয়েছেন ফৌজদারি

আদালতে। এই পরিবর্তনের মূলে কোন প্রতিক্রিয়া আছে। আপনি ভেবে দেখবেন।

আবার আমি চমকে উঠলাম।

কল্যাণী হাসলেন।

তাড়াতাড়ি আমি বললাম ঃ ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। চলুন একটা রেস্তোরাঁর ভেতরে বসি।

তাহলে হোটেলেই ফিরি।

হোটেলের নামে আমার মন ভরে উঠল না। বললাম ঃ তার আগে এক পেয়ালা কফি। চিনেবাদাম আপনার ভাল লাগে না ?

কল্যাণী হেসে বললেন ঃ লাগে।

এবারে আমরা একটা রেস্তোরাঁয় বসব।

সাত

রেস্তোর্াঁয় ঢুকে আমার বিস্ময়ের অবধি রইল না। কল্যাণী বলেছিলেন, একটু নিরিবিলিতে বসব। সেই নিরিবিলি খুঁজতে গিয়ে দেখি, অনাদিবাবু একটা কোণায় বসে পরম পরিতৃপ্তি সহকারে চা খাচ্ছেন। আমাদের দেখতে পেয়েই চমকে উঠলেন, মুখের উপরে নামল দুর্ভাবনার ছায়া। আমি তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললাম: আপনি নিশ্চিন্তে বসে খান, আমরা কাউকে এ কথা বলব না।

সহসা ভদ্রলোকের মুখে কোন উত্তর যোগাল না।

কল্যাণী বললেন: সরে আসুন, এই দিকটায় একটু ফাঁকা আছে।

আমরা সেই ফাঁকা জায়গায় এসে বসলাম। বললাম: কফি নয়, যা আপনার ভাল লাগে তাই বলুন।

বেয়ারাকে কল্যাণী বললেন ঝাল ঝাল কোন জিনিসের কথা, তার সঙ্গে চা। আমি হেসে বললাম: আপনার সঙ্গে আমি রোজ এখানে আসব।

কল্যাণী হেসে বললেন: আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে ঝালের ভয়ে আমি হোটেল বদল করেছিলাম। দুবার বলেও যখন ঝাল কমল না, আমাকে হোটেলই ছাড়তে হল।

এরা আপনার কথা শুনছে তো?

এদের ম্যানেজারকে তো দেখলেন। ওঁর নিজেরও বোধ হয় ঝাল চলে না। তাইতেই সুবিধে হয়েছে।

আজ অনাদিবাবুর মতো আপনারও সাহস বেড়েছে দেখছি।

সাহস বাড়ে নি, বেড়েছে অনিয়মের বাসনা। আজ বাঁধাবাঁধি নিয়ম কানুন থেকে একটু মুক্তি পেতে চাই।

একটু স্বাধীন জীবনের আস্বাদ, তাই নয়। তাহলে আমি কী করি ?

ভেবে দেখুন, কী আপনি করেন না, বা কী করা আপনার অনুচিত।

মনে পড়ল যে মেয়েদের সঙ্গেই আমি সহজ ভাবে মেলামেশা করি না, করতে পারি না। কোথায় একটা ক্ষত স্থান আছে, সেখানে বেদনার শেষ নেই। শীলাকে আমি ভালবেসেছিলাম, ভাবতাম সেও আমাকে ভালবাসে। সেই বিশ্বাস ভেঙে যাবার পর থেকেই আমার বিশ্বাস হারাবার বেদনা গভীর হয়েছে। আজ ইচ্ছা হল, এই অবিশ্বাসকে দূরে ঠেলে রাখি, কল্যাণীর সঙ্গে এই সন্ধ্যাটা সহজ ভাবে কাটিয়ে দিই। মন আমার প্রফুল্ল হয়ে উঠল।

কল্যাণী আমাকে লক্ষ্য করেছিলেন, বললেন ঃ কী স্থির করলেন ?

শুনবেন ?

কল্যাণী বুঝতে পারলেন যে আমি কোন তরল পরিহাসের কথা বলব। বললেন ঃ এখনও আপনার সঙ্কোচ যাচ্ছে না।

শুধু আজকের সন্ধ্যেটা আপনার সঙ্গে সহজ ভাবে কাটাব।

শুধু আজকের সন্ধ্যা ? কালকের নয়, পরশুর নয়, তার পরের দিনের ?

আমার ভাবনা যেন এলোমেলো হয়ে গেল। এ কথার কী উত্তর দেওয়া উচিত, তা ভেবে পেলাম না। একটা ভাল উত্তরের জন্য আমার মন যখন বুদ্ধির সঙ্গে পরামর্শ করছে, সেই সময়ে অনাদিবাবু আমাকে রক্ষা করলেন। চায়ের পাত্র শেষ করে তিনি ফিরে যাচ্ছিলেন। কাছে এসে হাত কচলে কৈফিয়ত দিলেন ঃ এ সব জায়গায় কখনও আমি আসি নে। আজ—

আজ একটু মন খারাপ হয়েছিল।

ঠিক বলেছেন। দুপুর থেকেই মনটা আজ ভাল নেই। হাজার হলেও ভদ্রলোক তো আমাদের সঙ্গেই ছিলেন।

তা তো বটেই।

ভদ্রলোক কৃতার্থ হলেন, বললেন: আপনি যে বুদ্ধিমান লোক, তা মুখ দেখেই আমি বুঝেছিলাম। ব্যাপারটা চট করে বুঝে গেলেন।

ভদ্রলোক বেরিয়ে যাবার আগে আর একবার ফিরে এলেন, বললেন: দেখবেন, ঐ হতভাগা ম্যানেজারকে যেন বলবেন না। ভদ্রলোক যেন আমার গার্জেন হয়েছেন।

আমি হেসে বললাম: আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি কিছুই বলব না।

অনাদিবাবু চলে যাবার পরেও কল্যাণী চৌধুরী অনেকক্ষণ কথা কইলেন না। চায়ের সঙ্গে মাংসের ঘুগনি এল। এক চামচে মুখে দিয়ে বললাম: বেশ জিনিস, তাই না?

উত্তরে কল্যাণী অন্য কথা কইলেন। আস্তে আস্তে বললেন: মায়ার কথা বলতে গিয়ে আমরা কোথায় পৌঁছে গেছি।

মায়ার কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। কল্যাণীর কথায় আবার মনে পড়ল। বললাম: তাকে আর আমাদের দরকার নেই। এবার আমরা স্বাধীন ভাবেই এগোতে পারব।

কল্যাণী হেসে বললেন: তা পারব। কিন্তু ঐ মেয়েটার সম্বন্ধে সন্দেহ আমার যাবে না।

কিসের সন্দেহ?

নির্মল সেনকে সে-ই ধরিয়ে দিয়েছে। প্রথম দর্শনেই এই সন্দেহ আমার মনে জেগেছে, আর প্রতি দিন তার সমর্থন পেয়েছি।

কল্যাণী বলতে লাগলেন, মায়া ও তার বাবা ফিরলেন নির্মল সেনের সঙ্গে। কল্যাণী তাদের পিছনে ছিলেন। কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছিলেন না। কিন্তু মায়ার হাসি শুনতে পাচ্ছিলেন থেকে থেকে। নির্মল

গম্ভীর ভাবে পথ চলছিল। নিজেদের হোটেলের সামনে এসে মায়ারা বিদায় নিল। নির্মল এগিয়ে গিয়েছিল, কল্যাণী পিছনে ছিলেন। শুনতে পেলেন, মায়া অত্যন্ত মৃদু স্বরে প্রশ্ন করল, কেমন দেখছেন? বৃদ্ধ ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, ধরতে হবে। তার পর দুজনেই চলে গেলেন হোটেলের ভিতরে।

এ ঠিক পিতা পুত্রীর মতো কথা নয়। এ তো জাল ফেলে পাত্র ধরা নয় যে কন্যা পিতাকে প্রশ্ন করবে পাত্রের সম্বন্ধে, আর পিতা তার কন্যাকে শিকার গাঁথবার আদেশ দেবে! অন্য কিছু অনুমান করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কল্যাণী তাদের গোয়েন্দা বলে সন্দেহ করলেন।

পর দিন সকালে মায়া একা এল। বিকালে আবার এল বেড়াতে টেনে নিয়ে যাবার সময়। মায়ার ছোটখাট টুকরো কথা কল্যাণীর কানে গেছে—আপনি বড় বেশি গম্ভীর, বড় চুপচাপ থাকতে ভালবাসেন; বাবা দাবায় বসেছেন, পৃথিবীর কথা এখন তাঁর মনে পড়বে না, ইত্যাদি।

নির্মল সেনের সন্ধন্ধে কল্যাণীর কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। বয়স বছর ত্রিশেক বলে অনুমান করে। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার আগেই যে জন্মেছিল, তাতে তাঁর সন্দেহ নেই। কেন না বন্ধুদের কাছে বয়স নিয়ে গর্ব করতে শুনেছে—আমি কি আর আজকের লোক হে, বিছানায় পড়ে না থাকলে ভিক্টোরিয়া ক্রস নিতাম। যুদ্ধের পরে পাওয়া পীস মেডেলটা নাকি এখনও আলমারিতে তোলা আছে। এটা বয়সের ধর্ম। এ বয়সে সব যুবকই বয়স বাড়িয়ে আনন্দ পায়। সত্যিই যখন বয়স বাড়বে, তখন আর এ কাজ করবে না।

নির্মলের পিতার পয়সা আছে বলেও কল্যাণী শুনেছিলেন। যুদ্ধের সময় বাণিজ্যে নেমে লক্ষ্মীকে তিনি সিন্দুকে আটকেছেন। নির্মলের শৈশবেই তাঁর স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন নি। বিবাহে নির্মলেরও নাকি রুচি নেই। এটা বুঝি যুগের হাওয়ায়।

সারা জীবনের সঙ্গী হিসাবে যাকে গ্রহণ করতে হবে, তাকে ভাল করে দেখে শুনে বাজিয়ে নেওয়া দরকার। এই বাজিয়ে নেবার নামে যথেচ্ছাচার চলছিল বলে কল্যাণী মনে করেন।

লেখাপড়া শিখে নির্মল চাকরিতে ঢোকে নি। বাপের ইচ্ছায় বাপের ব্যবসাতেই কতকটা দায়িত্বহীন ভাবে কিছু দেখাশুনো করছিল। আরও সব কর্মচারীর মতো মোটা মাইনে নেয়, ছুটি নেয় প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে, ঘোড়দৌড়ের মাঠে জাঁকিয়ে বসে, ক্লাব ও জুয়ার আড্ডায় তার জুড়ি মেলে না। মনোজ মিত্র তার নাম দিয়েছিল হিরো।

এই নির্মল সেন কী করে এখানে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছে, সেই ভেবে কল্যাণীর আশ্চর্য লাগছিল। এইবারে মায়ার এই ঘনিষ্ঠতা দেখে তাঁর সন্দেহ রইল না যে দু দিনেই সে এই মেয়েটার কাছে বাঁধা পড়বে। যন্ত্র তো ভাঙ্গা নয়, যন্ত্র মরচে পড়া, যন্ত্রীর হাতের স্পর্শেই ঝনঝন করে বেজে উঠবে।

কল্যাণী গোপন করবেন না তাঁর দুর্বলতার কথা। নির্মলের দিকে তিনি অতিরিক্ত বেশি নজর দিতে শুরু করলেন। তাঁর মনে হতে লাগল যে দার্জিলিঙের এক ঘেঁয়ে জীবনে নির্মল ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কলকাতার যে রঙীন হাল্কা সন্ধ্যাগুলি তাকে এত দিন মাতাল করেছে, সেই নেশা এখনও তার রক্তে লেগে আছে, এখনও তাকে চুম্বকের মতো টানছে। তারই সঙ্গে একটা মর্মান্তিক যন্ত্রণা আছে, নানা আশঙ্কায় তার সবল স্নায়ুগুলো জড়ের মতো অসাড় হয়ে যাচ্ছে। দেহটা চাঙ্গা হয়ে উঠতে না উঠতেই একটা পুঞ্জিত গ্লানির ভারে মনটা মিইয়ে যাচ্ছে। নির্মল ডাক্তার দেখাচ্ছিল, টনিক খাচ্ছিল, আর আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে কত অসম্ভব আজগুবী কথা ভাবছিল।

সেদিন মায়াকে নির্মলের ঘরে ঢুকতে দেখে কল্যাণী এসে পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়েছিলেন। পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন

নির্মলকে। সে খোলা জানলা দিয়ে বাহিরের দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ একখণ্ড মেঘ এসে রৌদ্রকে ঢেকে দিল, একটা গাঢ় নীল ছায়া এল সামনের দিকে এগিয়ে। নির্মল চমকে উঠল। অতর্কিতে দেহটা উঠল থরথর করে কেঁপে। মায়া যে তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল, তা সে লক্ষ্য করে নি। এবারে তার প্রশ্ন শুনে আর একবার চমকে উঠল।

কী হল, অমন চমকে উঠলেন যে?

নির্মলকে বড় অসহায় দেখাল। যেন তার একটা গভীর অপরাধ হঠাৎ ধরা পড়ে গেছে। মায়ার কথার উত্তর তার মুখে যোগাল না।

মায়াই আবার বলল : স্বপ্ন দেখছিলেন বুঝি?

খোলা খবরের কাগজটা মাটিতে ছড়িয়ে পড়েছে। মায়া সেখানা কুড়িয়ে নিয়ে গুছিয়ে রাখল। বলল : এই খুনের খবরটায় আপনি খুবই বিচলিত হয়েছেন। হবারই কথা। মনোজবাবু তো আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

কল্যাণী চৌধুরী সরে এসেছিলেন। বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ধরা পড়বার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। কিন্তু মায়াকে তিনি ধরে ফেলেছেন। মায়ার সম্বন্ধে আর তাঁর কোন সন্দেহ রইল না।

খানিকটা পরে নিজের ঘর থেকে কল্যাণী দেখলেন, মায়ারা বেড়াতে গেল। মেয়েটা নিত্য নূতন সাজ করে আসে। নিত্য নূতন হবার বাসনা। বয়স কম বলেই তত বেমানান হয় না। কিন্তু নির্মল কেন এমন বোকামি করছে! নিজের ভালমন্দ সে কি বুঝতে পারছে না! মায়াকে প্রশ্রয় দিয়ে সে যে বিপদেরই আশ্রয় নিচ্ছে। কল্যাণী পথে বেরিয়ে অস্থির ভাবে পায়চারি করলেন। সম্ভব অসম্ভব অনেক কথা ভেবে অশান্ত হলেন। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলেন যে নির্মল ফিরে এলে আজ রাতেই তাকে সাবধান হতে বলবেন। এই সিদ্ধান্ত নেবার পর

তাঁর খানিকটা আরাম বোধ হল। প্রসন্ন চিত্তে তিনি নিজের ঘরে ফিরে এলেন।

নির্মলের ফিরতে সেদিন দেরি হয়েছিল। বোধ হয় জলাপাহাড়ে উঠেছিল। দেহে ক্লান্তির ছাপ ছিল, কিন্তু মনে ছিল সজীবতা। নির্মল তার ঘরে ঢুকল শিস দিতে দিতে। ঠিক এই সময় তার ঘরে ঢুকতে কল্যাণীর সংকোচ বোধ হয়েছিল। মনে হয়েছিল, নির্মল তাকে অসৎ ভাবতে পারে। অন্ততঃ তার সন্দেহের কথা শুনে নির্মল বিশ্বাস করবে না, হেসে উড়িয়ে দেবে। কিংবা এই ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপের জন্য অপমানও করতে পারে।

করুক অপমান। একটা মানুষকে নিগ্রহের হাত থেকে রক্ষা করতে পারলে সে অপমান তাঁর গায়ে লাগবে না।

এইখানে আমি কল্যাণীকে বাধা দিলাম। বললাম: নির্মলকে আপনি কোন দিন শ্রদ্ধা করেন নি। বরং মনোজ মিত্রকে হয়তো ভালবেসেছিলেন। মনোজ মিত্রকে যে খুন করেছে, তার প্রতি বিরূপ হওয়াই আপনার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল।

যতটুকু শুনেছেন, তারপর এই ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু মনোজ মিত্রকে আমি ঘৃণা করতে শিখেছিলাম। শিখিয়েছিলেন আপনার স্ত্রী।

আমাকে অভিভূত হবার সময় না দিয়ে কল্যাণী বললেন: নির্মল সেনকেও ঘৃণা করতাম, ঘৃণা করতে শিখলাম অপদার্থ সংঘের প্রত্যেকটি অপদার্থকে। সেদিন যদি ঐ সংঘের ভবনের উপর একটা বোমা পড়ত, আর সমস্ত অপদার্থ মরত বাড়ি চাপা পড়ে, তাহলে আমার একটুও কষ্ট হত না, বরং একটা পৈশাচিক আনন্দে মন আমার ভরে যেত। পরে আমি সবাইকে ক্ষমা করেছি। এখন আমার কারও ওপর এতটুকু অভিমান নেই।

কল্যাণী চৌধুরীর কাছে মনোজ মিত্রের অপরাধের গুরুত্ব আমার জানা নেই। কিন্তু কল্যাণী যা বললেন, তাতে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে কোন সময় শীলা তাঁদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। এ সংবাদ আমার জানা নেই। কল্যাণী নিজে না বললে কৌতূহল প্রকাশ করা আমার পক্ষে অন্যায় হবে। তবে এইটুকু বুঝতে পেরেছি যে শীলা তাঁকে সাবধান না করলে কল্যাণীর জীবনটা অন্য রকম হত, আত্মহত্যা করতে হত কিনা জানি না। তাই আমি প্রশ্ন করলাম: কিন্তু ক্ষমা তাদের কী করে করলেন?

ক্ষমা করে নিজেরই তো উপকার করেছি। মহৎ ভাবতে পারছি নিজেকে।

সেই সঙ্গেই যোগ করলেন: আর আপনার দুর্বলতা আজও যায় নি বলে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারছি।

আর একটু খুলে বলবেন কি?

আমার মুখে আর নাই বা শুনলেন। আপনি বুদ্ধিমান বিচক্ষণ, একটু নিরিবিলিতে চিন্তা করলেই আপনার কাছে সমস্ত স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

বেয়ারা এসেছিল এঁটো প্লেট তুলে নিতে। তাকে বললাম, আর এক প্লেট ঘুগনি আধাআধি করে দিতে। পটে আরও চা ছিল। কল্যাণীকে বললাম: মায়ার গল্পটাই তাহলে শেষ করুন।

কল্যাণী বললেন, সেই রাত্রে তিনি নির্মলের কাছে গিয়েছিলেন। বাহিরের শীতার্ত রাত্রি স্তব্ধ হয়ে প্রহর গণনা করছে। সূর্যাস্তের পর কত মুহূর্ত গেল। পৃথিবী ঘুমবে। তারপর আবার প্রহর গণনা, সূর্যোদয়ের আর কত মুহূর্ত বাকি। মানুষের জীবনেও এই কত গেল আর কত রইল, তার অবিরাম গণনা চলছে।

কল্যাণীর কথা শুনে নির্মল সেন হেসে উঠেছিল। মায়ার বাবা বিপিন বাবু নাকি উত্তর বঙ্গের এক আদালতে ওকালতি করেন। চারি-

দিকে চা বাগানেও তাঁর শেয়ার আছে। পুরনো প্রতিষ্ঠিত পরিবার বলে এঁদের খ্যাতি কম নয়।

কল্যাণী বললেন, এই পরিচয়ে বিপিনবাবুর সম্বন্ধে যে ধারণা হওয়া উচিত তা তাঁর হয় নি। বৃদ্ধের চোখের দৃষ্টি শ্যেনের মতো তীক্ষ্ণ। মাথার চুল ও দাড়ি অকালপক্ক না হলে বয়স তাঁর ষাটের কম বলা উচিত হবে না। তাঁর পাশে সুদর্শনা মায়াকে মেয়ের বদলে নাতনি বলে মনে হয়েছিল।

নির্মলকে কল্যাণী যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে তার সতর্ক হবার প্রয়োজন আছে। নির্মল এ কথা মানে নি। কল্যাণী বলেছিলেন, আমি আপনার সুহৃৎ। নির্মল বলেছিল, ঈর্ষায় আপনি কাতর হয়েছেন। এ কথার পরে কল্যাণী কথা বলেন নি, অপমানে মাথা নিচু করে তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন।

কিন্তু আপনার তো লজ্জা পাওয়া উচিত ছিল না।

না।

তবে?

মেয়ে হয়ে লজ্জাকে জয় করা লজ্জার কথা।

মুগ্ধ বিস্ময়ে আমি কল্যাণীর মুখের দিকে তাকালাম। কল্যাণীকে আমার শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা হল।

ফেরার পথে কল্যাণী বললেন : আপনাকে একটা অনুরোধ করব?

নিশ্চয়ই করবেন।

নির্মল সেনকে বাঁচাবার দায়িত্ব আপনি নিজে গ্রহণ করুন।

আমি চমকে উঠলাম। কল্যাণী যে কথা কইছেন, আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না। পথের আলোয় আমি তার মুখ খুব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সে মুখে অভিমান নেই, ঘৃণা নেই, বেদনা নেই। প্রসন্ন ক্ষমায় উজ্জ্বল দেখাচ্ছে কল্যাণীর মুখ।

তবু আমি রাজী হতে পারলাম না। বললাম : আমাকে এমন অনুরোধ করবেন না।

কেন করব না ? পাপীকে শাস্তি দেবার সংকল্প নিয়ে দেওয়ানি ছেড়ে ফৌজদারি আদালতে গেছেন বলে ?

আমি চমকে উঠলাম। কল্যাণী এ সংবাদ কোথায় পেল ! এ সত্য যে আমার কাছেই এত দিন অজ্ঞাত ছিল। আমি তো এ কথা কোন দিন ভাবি নি।

কল্যাণী হাসছেন। এখন আর তাঁর একটুও আড়ষ্টতা নেই। কল্যাণীর কাছে হার মানবার আগে আমি নিজের চারিধার একবার দেখে নিলাম। কিন্তু ও কে ? আমাকে পিছনে তাকাতে দেখে ও কেন পিছন ফিরল। তন্বী শ্যামা সুদর্শনা মেয়ে। তার মুখে রঙ আর সরু ভ্রূ আমি দেখতে পেয়েছি। ওরই নাম কি মায়া ?

আট

হোটেলের বাহিরে অনাদিবাবু পায়চারি করছিলেন, আমাদের দেখতে পেয়েই পুলকিত হয়ে উঠলেন। বললেন : ফিরলেন! আস্থন আস্থন, আপনাকে একেবারে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি।

বলে পাশে পাশে হাঁটতে লাগলেন। আমি লক্ষ্য করে দেখলাম যে ম্যানেজারের অফিস ঘর পেরবার সময় তিনি আমাকে আড়াল করে নিয়ে চলেছেন। ভারি দেহ নিয়ে নিজে ছিলেন দরজার দিকে, সতর্ক ভাবে পা ফেললেন আমার পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে। কল্যাণীকে একটা নমস্কার করে এগিয়ে দিয়ে আমার সঙ্গে আমার ঘরেই ঢুকে পড়লেন।

তাঁর কাণ্ড দেখে হাসি পায়, কিন্তু হাসবার উপায় নেই। তাই গম্ভীর ভাবে বললাম : তার পর, খবর কি বলুন।

আর খবর! ভয়ে সবাই মুষড়ে পড়েছেন। বেড়াতে এসে এ কী বিপদ!

মায়ার খবর আনতে ম্যানেজার লোক পাঠিয়েছিলেন, তার কী খবর এল?

পাঠিয়েছিলেন বুঝি! কিন্তু খুব সাবধান। ঐ লোকটাকে আপনি সব সময় এড়িয়ে চলবেন। বেঁটে খাট চেহারার ছোট মানুষ বটে, কিন্তু পাকা শয়তান। আপনার সংসারটা ছারখার করে দেবার মতো বুদ্ধি রাখে।

তাই বুঝি?

তাই নয়! তা না হলে কোন ভাল ভদ্রলোক কি অন্যের স্ত্রীর সঙ্গে পত্রালাপ করে! আমার স্ত্রী যদি আমার খবরের জন্য ব্যস্ত হন তো আমি তাঁকে খবর দেব। হোটেলের ম্যানেজার বলে কি আমার

গার্জিয়ান হয়েছেন! হোটেলের মালিক হলে কী করতেন, আমি তাই ভাবি।

একটু চা দিতে বলব?

চা!

ভদ্রলোকের চোখের দৃষ্টি জ্বলজ্বল করে উঠেই নিবে গেল, বললেন: চা আর দরকার নেই মশাই। সুখে থাকতে ভূতের কিল খেতে আর ইচ্ছে নেই।

হেসে বললাম: ভয় পেলেন নাকি?

ভয় বলবেন না, ভয় বলে কোন পদার্থ অনাদি সিংহের শরীরে নেই।

ভদ্রলোক একবার নিজের শরীরটা দেখলেন, তার পর বললেন: রাজেনবাবুর আখড়ায় মশাই শরীর চর্চা করেছি। পেটে চা না সইতে পারে, শরীরে ভয় ঢুকতে পারে নি।

ভয় তো মনে থাকে!

ভদ্রলোক ঘাবড়ে গেলেন, বললেন: না না, মন টনের কথা আর তুলবেন না। বড় গোলমেলে কথা ঐ মন। দুটো অক্ষর যে এমন জট পাকাতে পারে জানা ছিল না।

ভদ্রলোক বসতে গিয়েও আর বসলেন না। আমি তাঁকে ডেকে বললাম: একটু বসে যান, বলে যান কোথায় কী জট পাকাল।

অনাদিবাবু ভয়ে ভয়ে বসে পড়লেন, বললেন: ম্যানেজারবাবু তো তাই বলছিলেন, মন দেওয়া নেওয়া করতে গিয়েই নির্মল সেন ধরা পড়ল। ঐ মনটা না থাকলে কি আর তাঁর খুনের কথা ধরা পড়ত!

খাঁটি কথা। ঐ মনটা না থাকলে হয়তো খুনও করতেন না।

এও তো খাঁটি কথা।

হঠাৎ বললাম: আচ্ছা অনাদিবাবু, পাশের ঘরের ঐ মহিলাকে আপনি ভয় পান না? তিনিও তো আপনাকে চা খেতে দেখেছেন?

অনাদিবাবু একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করলেন ঃ কারও সঙ্গে আলাপ নেই, ম্যানেজারের সঙ্গেও না। এই হোটেলে যে থাকেন, তাই অনেকে জানেন না।

তারপরেই হঠাৎ ঘনিষ্ঠ ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আপনার আত্মীয় বুঝি ?

না।

প্রতিবেশী ?

তাও না।

তবে নিশ্চয়ই পুরনো পরিচিত।

এ কথার উত্তর না দিয়ে আমি হাসলাম। কিন্তু অনাদিবাবু অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললেন ঃ কিছুই যদি না হন, তাহলে একটু সাবধান হবেন। ঐ শয়তান ম্যানেজার সব দেখেছেন। আপনার ঠিকানাও আছে ওর খাতায় লেখা। একখানা চিঠি দিয়ে আপনার সাজানো সংসার তছনছ করে দেবেন।

ভদ্রলোকের কথা আমি উপভোগ করছিলাম। তাই অনুমান করে বলে উঠলেন ঃ এখন আপনি সাহস দেখাচ্ছেন, পরে কিন্তু পস্তাতে হবে। হোটেলে এরই মধ্যে কথা উঠেছে।

তাই নাকি !

এমনিতেই ভদ্রলোকের ক্ষীণ কণ্ঠ, তাতে আরও সন্তর্পণে বললেন ঃ মাংসের ঘুগনি খেতে আপনারা বেরিয়েছিলেন, আমি স্বচক্ষে দেখে এলাম। আর এ দিকে পাঁচ জনে পাঁচ কথা আলোচনা করছে।

তারপরেই আশ্বাস দিলেন ঃ তা করুক, আপনি ভয় পাবেন না, ম্যানেজারকে আমি সামলাব।

ঘর ছেড়ে যাবার আগে বলে গেলেন ঃ দেখবেন মশাই, আমার

কথাটা যেন প্রকাশ না হয়। ভয় আমি পাই নে, তবু বুঝেছেন কী—অনর্থক ঝামেলা বাড়াতে আর ইচ্ছে নেই।

আমি আবার ভরসা দিলাম: আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

তা আছি বৈকি। কোন ছোট কাজ যে আপনি করতে পারবেন না, তা আমরা বুঝতে পেরেছি।

অতিরিক্ত বিনয়ে ভদ্রলোক নমস্কার জানিয়ে গেলেন।

নয়

কল্যাণীর একটা কথা আমার হৃদয়কে গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছে। যে কথা আমি নিজে কোন দিন ভাবি নি, সে কথা কল্যাণী আমাকে ভাবতে বললেন। এমন অবলীলাক্রমে বললেন যে আমি সন্দেহ করবারও সুযোগ পেলাম না।

আমি আমার অতীতটা স্মরণ করবার চেষ্টা করলাম। শীলার মৃত্যুর পর তিন বৎসর এখনও পূর্ণ হয় নি। কিন্তু আমার জীবনের উপর দিয়ে বুঝি অনেক তিন বৎসর গড়িয়ে গেছে। আমি আমার যৌবনটাকে হারিয়ে ফেলেছি নিজের অজ্ঞাতসারে।

কল্যাণী বলছিলেন, আমি দেওয়ানি থেকে ফৌজদারি আদালতে এসেছি একটা প্রচ্ছন্ন প্রতিক্রিয়ার ফলে। শীলার আত্মহত্যার পিছনে পাপের গোপন অভিসার ছিল। সেই পাপ আমাকে পাগল করেছে, প্রতিহিংসাপরায়ণ করেছে। পাপীর উপর প্রতিহিংসা নৈবার জন্যই আমি নাকি দেওয়ানি ছেড়ে ফৌজদারি আদালতে এসে যোগ দিয়েছি। কল্যাণী কি সত্য কথা বলছেন ?

বিলাতে ব্যারিস্টারি পড়তে যাওয়ার কথা আমার মনে পড়ল। শুনেছিলাম, ব্যারিস্টারদের শপথ গ্রহণ করতে হয় বিনা পারিশ্রমিকে নির্দোষের পক্ষ সমর্থন করবার। এ কথা কবে কার কাছে শুনেছিলাম মনে নেই, কিন্তু একদা আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। আমি যখন দেওয়ানি ছেড়ে ফৌজদারি আদালতে আসি, তখন এই কথা আমার নূতন করে মনে পড়ে। মামলা গ্রহণ করবার আগে আমি জিজ্ঞাসা করতাম, আসামী কে ? আসামী পক্ষের মামলা কি আমি কখনও হাতে নিয়েছি ? মনে পড়ছে না।

অনাদিবাবু চলে যাবার পরে একটা চুরট ধরিয়েছিলাম। সেই চুরটের ধোঁয়ায় অনেকখানি স্থান আচ্ছন্ন হয়েছে। ঘরের আবহাওয়াও হয়েছে অনেকখানি ভারি। বুকের উপর যেন খানিকটা চাপ পড়েছে। গত তিন বছরে যত মামলা করেছি, একে একে সেই সমস্ত মামলা মনে পড়তে লাগল।

মিথ্যা মামলায় যারা জড়িয়েছে, তাদের আমি বাঁচিয়ে এনেছি। উৎপীড়িতকে রক্ষা করেছি পরম যত্নে। কিন্তু সে তো পয়সার জন্য করেছি, জীবিকার জন্য, সুনামের জন্য। এ সবের জন্য যা করি নি, সেই কথা আমাকে স্মরণ করতে হবে।

১৯৪৬ সালের একটা মামলার কথা আমার মনে পড়ল। চারুশীলার মামলা। রাজেন দাস নামে একজন বিপত্নীক ঠিকাদারের কাছে চারুশীলা ঘর করতে গিয়েছিল। তার স্বামী মামলা দায়ের করে। আমি ছিলাম চারুশীলার স্বামীর পক্ষে উকিল। রাজেন দাসের কঠিন শাস্তিবিধানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম। ফলে তার সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। সেই মামলায় আমার খুব সুনাম হয়েছিল। অনেকে বলেছিল, এ রকমের সওয়াল জবাব নাকি অনেক দিন হয় নি।

এর পরেই মনে পড়ল, গত বছরের সেই মামলাটার কথা। নবীন পালের মামলা। তার স্ত্রী পালিয়ে গিয়েছিল। এই ঘর-পালানো বউকে সে ত্যাগ করতে চায়। তার স্ত্রীর পক্ষে কোন উকিল ছিল না। দু-একটা সওয়াল করতেই স্ত্রীলোকটি কেঁদে ফেলল। তাকে আড়ালে ডেকে সব কথা জেনে নিলাম। নবীন পাল মদ্যপ, অসচ্চরিত্র। স্ত্রীকে দূর করতে পারলে নূতন মেয়েমানুষ নিয়ে ঘর করবে, পথের কাঁটা সরাতে চায়। তার স্ত্রী কেঁদে বলল, সে না পালালে সেই রাতেই তাকে কেটে ফেলত। নবীন পালের প্রচুর কাঁচা পয়সা ছিল। তার টাকা

তাকেই ফিরিয়ে দিয়ে আমি তার নিঃস্ব স্ত্রীর পক্ষ নিয়ে লড়লাম। লোকটার চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড হল।

আমি যে ঘন ঘন চুরট টানছিলাম, সে দিকে আমার খেয়াল ছিল না। গরম ধোঁয়ায় গলা আমার জ্বলে যাচ্ছিল, মাথা ভারি ঠেকছিল। একটা দুটো নয়, অসংখ্য মামলার কথা আমার মনে পড়ছে। এক একটা মামলা নিয়ে আমি মেতে উঠতাম, পাগলের মতো পরিশ্রম করে শাস্তির ব্যবস্থা করতাম। লোকে আশ্চর্য হত, নিষ্ঠুর বলত, আমার বন্য আনন্দ দেখে বর্বর বলতেও লোকে দ্বিধা করত না। কিন্তু আমি সে কথায় কোন দিন কান দিই নি। ফৌজদারী আদালতে তিন বছরেই আমি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলাম।

কল্যাণী চৌধুরী ঠিকই বলেছেন। আমার হৃদয়ে একটা প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি দিনে দিনে নিষ্ঠুর হয়ে উঠছে। এ প্রবৃত্তি আমার সহজাত নয়, এ একটা প্রতিক্রিয়া। শীলার মৃত্যুর পরেই এই প্রকৃতির সূত্রপাত হয়েছে। দিনে দিনে ভীষণ আকার ধরেছে। মানুষের ধর্মকে রক্ষা করবার নামে নিজের মনুষ্যত্বই বুঝি আমি বিসর্জন দিচ্ছি। কিন্তু কল্যাণী এ কথা কার কাছে জানল? নিশ্চয়ই সে কোন সত্য গোপন করেছে। সে আমাকে চেনে, সে আমাকে জানে, সে আমার—

হাতের চুরটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমি বেরিয়ে এলাম। কোথায় তার চার নম্বর ঘর? কোথায় কল্যাণী লুকিয়ে আছে? তাকে আমার আবিষ্কার করতেই হবে।

ঝড়ের মতো চার নম্বর ঘরে ঢুকে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। উজ্জ্বল আলোর নিচে বসে কল্যাণী আদালতের আত্মকথা পড়ছে।

আমার অশিষ্ট আচরণে কল্যাণী আপত্তি করল না। বইখানা মুড়ে রেখে উঠে দাঁড়াল। মুখে প্রসন্ন হাসি।

উন্মত্তের মতো আমি বলে উঠলাম ঃ হাসি নয় কল্যাণী, আমি তোমার জবাব চাইতে এসেছি।

কল্যাণী তার চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলল ঃ বসে প্রশ্ন কর, জবাব নিশ্চয়ই দেব।

আগে জবাব দাও, তার পরে বসব।

কল্যাণী হেসে বলল ঃ কিসের জবাব?

আমার দুর্বলতার কথা তোমায় কে বলল?

এই কথা!

কল্যাণী তার বইখানা তুলে ধরল, বলল ঃ এই বিশ্বাসঘাতক বই তো জড়পদার্থ নয়, বইএর প্রাণ আছে, চুপি চুপি তারা মানুষের মতোই কথা বলে।

আমি বসে পড়লাম। আমার মাথা ঘুরছিল। আমার বলার কথা সব এলোমেলো হয়ে গেছে।

কল্যাণী তার চেয়ার টেনে এনে আমার পাশে বসল। বলল ঃ অত বিচলিত কেন হচ্ছ?

বিচলিত হবার মতোই কথা।

তা নয়, জীবনটা যদি অঙ্ক হত, তাহলে তার উত্তর হত সকলের বেলাতেই এক। জীবন বিচিত্র হয়েই মুস্কিল হয়েছে। বাঁধা কোন ছকে পড়ে না, অথচ তার ছন্দ আছে।

আমার অস্থিরতা কমে এসেছিল। খানিকটা সুস্থ হতেই লজ্জা পেলাম। আমার উত্তেজনা দেখে কল্যাণী কী ভাবল!

কিন্তু কল্যাণী কিছুই বোধ হয় ভাবে নি। সে তার নিজের কথাই বলল ঃ তোমার স্ত্রীর মৃত্যুতে তুমি একটা অস্বাভাবিক আঘাত পেয়েছিলে। ভেবেছিলে, তোমার অমনোযোগেই এমন ঘটনা ঘটল। মনোযোগ দিলেও তুমি এ দুর্ঘটনা এড়াতে পারতে না। শুধু একটা

বিশ্রী সন্দেহে নিজের মনটা আবিল করতে। তা না করে ভালই করেছ।

অনেকক্ষণ থেকেই আমি লক্ষ্য করছিলাম যে, কল্যাণী ঘুরে ফিরে আমার ব্যক্তিগত কথার মধ্যে এসে পড়েছে। উভয়ের পরিচয় এত ঘনিষ্ঠ নয় যে এ সব আমাদের আলোচনার বিষয় হতে পারে। তবু যেন অবান্তর মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে না অশিষ্ট আলোচনা। বললাম: একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করব?

অত সঙ্কোচ কিসের? আমি তো কোন অনুমতির অপেক্ষা রাখি নে।

সে কথা সত্যি। কিন্তু আমি যে দুঃসাহসী হতে চাইছি। জানতে চাইছি, তুমি বিয়ে কর নি কেন?

খিলখিল করে কল্যাণী হেসে উঠল। পাহাড়ী ঝর্ণার মতো হালকা আবেগে উচ্ছল হাসি। কল্যাণীকে এতক্ষণ আমি এমন করে হাসতে দেখি নি। আমি লজ্জা পেয়ে বলে উঠলাম: এ আমার একটা কৌতূহল, আর কিছু নয়।

আর কিছু হলেই বা লজ্জা পাবার কী আছে!

কে বললে লজ্জা আমি পেয়েছি?

তা না হলে উত্তরের অপেক্ষা না করে প্রশ্নের কৈফিয়ৎ কেন দিচ্ছ?

এ তোমার উত্তর এড়িয়ে যাবার ছল, কিন্তু আমি মানব না। আমি তোমার উত্তর চাই।

এই তো সাহস হয়েছে তোমার। এইবারে জবাব দেব। মনোজ মিত্রের পর আর একটা পুরুষের সন্ধান পাই নি। যে তার দাবী জানাতে পারে না, সে আবার কেমন পুরুষ!

মনোজকে কেন বিয়ে করলে না?

বলেছি তো, তোমার স্ত্রী আমাকে বারণ করেছিল।

এ কথা বল নি।

তবে কি আমার চোখ খুলে দিয়েছিল বলেছি? ও দুটোই এক কথা। আসলে জানতে পারলাম যে মনোজ মিত্র শুধু আমাকে ভালবাসে না, আমার মতো আরও অনেককে ভালবাসে। তারা আবার ভালবাসে, না ভালবাসার ভান করে, তাই নিয়ে সন্দেহ করেছে। সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে লোকটার পয়সা ছিল না। নির্মল সেনের পয়সায় মদ খেত, আর ফুর্তি করত মেয়েদেরই পয়সায়।

আমি স্তম্ভিত হয়ে কল্যাণীর কথা শুনছিলাম। কিন্তু সে খুব সহজ ভাবে বলল: ভাবছ, খুব আঘাত পেয়ে তপস্বী হয়েছি, তা মোটেই নয়। আঘাত যতটুকু পাবার, ঠিক ততটুকুই পেয়েছি, তার বেশি একটুও না। সেও মনোজ মিত্রের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য নয়। সে এই সমাজের নগ্ন রূপটা দেখে। কয়েকটা দিনেই আমি অদ্ভুত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলাম।

কল্যাণী খানিকক্ষণ নিঃশব্দে কাটাল। তারপর বলল: নিজেকে আমি অশুচি ভাবি, ভালবাসতে ভয় পাই কোন নতুন পুরুষকে। সত্যকে পুরুষ ভয় পায়। তাই বলে মিথ্যা দিয়ে নারী কেন পুরুষ ভোলাবে!

আমি শীলার কথা ভাবছিলাম। শীলার সঙ্গে কল্যাণীর প্রভেদটা কোথায়? মনোজ মিত্রকে শীলা বিবাহের আগে দেখেছে, না পরে! বোধ হয় আগেই দেখেছে। বোধ হয় তার পিতাও এ কথা জানতেন। সেই ভদ্রলোকের সতর্কতার কথা আমার মনে পড়ল। বোধ হয় ভেবেছিলেন, মনোজ মিত্রের সঙ্গে তাঁর মেয়ের অন্তরঙ্গতা বিবাহের পরেই ফুরিয়ে যাবে। তা ফুরোয় নি, ধরা না পড়লে হয়তো কোন দিন ফুরোত না।

কিন্তু আত্মহত্যা সে কেন করল? অনুশোচনা? কল্যাণী তো

আত্মহত্যা করে নি! এমন কোন লজ্জার মুখোমুখি হয় নি যে আত্মহত্যা করা ছাড়া আর তার অন্য উপায় ছিল না। কী জন্য সে এমন সাংঘাতিক কাজ করতে গেল!

কল্যাণী হাসছিল। সে বড় ম্লান হাসি। বলল: তাইতেই কল্যাণী চৌধুরী কুমারী রয়ে গেল।

শীলাও তো বিবাহিত স্ত্রী থাকতে পারত!

পারত না।

কেন?

কল্যাণীর মন্তব্য শুনে আমি চমকে উঠলাম। কিন্তু সে বড় শান্ত ভাবেই জবাব দিল: কল্যাণী নিজে ঠকেছে, কাউকে ঠকায় নি। শীলা তার স্বামীকে ঠকাতে গিয়ে নিজেই ঠকে গিয়েছিল।

কল্যাণী থামল না, বলল: কোথাও ঠকে গেলে সে কথা স্বীকার করা যায়, ক্ষমা চাইতেও দ্বিধা আসে না। কিন্তু—

বুঝতে পেরেছি। কাউকে ঠকাবার জন্যে বেরিয়ে যদি নিজে ঠকে, তাহলে আর ফিরে আসা যায় না।

কল্যাণী দৃঢ় ভাবে বলল: তাও যায়। তোমার কোন দুর্বলতার সংবাদ জানা থাকলে ফিরে আসবার কথা সে ভাবতে পারত।

শীতের রাত্রি আজ থমথম করছে। কিন্তু আড়ষ্টতা নেই। থমথমে মন স্তব্ধ হয়ে থেমে পড়তে চাইছে না। চলতে চাইছে, ছুটতে চাইছে। কল্যাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার জানতে ইচ্ছা হল, তারও মন এমনি ছুটতে চাইছে কিনা।

কল্যাণী বলল: অমন করে তাকিয়ে কী দেখছ?

তোমাকে।

ভেব না লজ্জা পাব, লজ্জা পাবার বয়স গেছে পেরিয়ে।

বিয়ের বয়সটা বোধ হয় পেরয় নি।

কল্যাণী হেসে বলল ঃ মনটা যে রাঙা হচ্ছে না।

কেন হচ্ছে না! নিশ্চয়ই হচ্ছে! কল্যাণী লুকোচ্ছে সত্য কথা। লজ্জায় লুকোচ্ছে। আমি তাকে মিথ্যা বলতে দেব না। বললাম ঃ নিজেকে আর ঠকিয়ো না কল্যাণী, এখন তোমার বয়স হয়েছে।

বয়স হয়েছে বলেই তো বলছি, আর ঠকতে চাই না। তুমি তোমার স্ত্রীকে আজও ক্ষমা করতে পার নি, কোন দিন পারবে কি আর কাউকে ক্ষমা করতে ? ঐ একটি হিংসা সারা জীবন ধরে তোমাকে পোড়াবে।

গভীর বিস্ময়ে আমি কল্যাণীর মুখের দিকে তাকালাম। বড় স্থির প্রশান্ত দৃষ্টি। কোথাও একটু অস্থিরতা নেই, নেই চঞ্চলতা। মনে হল, তার জীবনটা আজ ধূপের মতো পুড়ছে, আর আমি তার সৌরভে হচ্ছি মুগ্ধ। প্রদীপের শিখার মতো কল্যাণীকে পবিত্র মনে হচ্ছে। গভীর ভাবে কল্যাণীকে আবেদন জানালাম ঃ তুমি কি আমাকে পবিত্র করবে না ?

মানুষকে যা পবিত্র করে, সেই প্রেম তোমার মনেই আছে। তার জন্য আমার সাহায্যের দরকার হবে না।

বলবার কথা আমার ফুরিয়ে গেছে। কল্যাণীর ঘর থেকে আমি বেরিয়ে এলাম।

দশ

আহারের পর নিজের ঘরে বসে একটা চুরট ধরিয়েছিলাম। আকাশ-পাতাল নানা কথা মনে আসছে। অনেক এলোমেলো অগোছালো কথা। তাদের একটার সঙ্গে আর একটার কোন যোগ নেই। পর পর বলে গেলে অর্থহীন প্রলাপ মনে হবে। তবু তারা এগিয়ে আসছে, বিপর্যস্ত করছে আমার বুদ্ধিকে।

কল্যাণীর কাছে আমি আজ ছোট হয়ে গেছি। এ দুর্মতি আমার কেন হল! কেন উন্মত্ত হলাম! কেন নিজেকে এমন ছেলেমানুষের মতো হারিয়ে ফেললাম! তাকে বোধ হয় আর আমার মুখ দেখাতে পারব না!

এই চুরটগুলো বড় কড়া, বড় তেতো।

দার্জিলিঙে এসে বড় ভুল করেছি। গল্প লেখা এখানে হবে না। এমন আড়ষ্ট রাতে আঙুলগুলো সব টনটন করছে। লিখব কী করে!

কল্যাণী রাতে কী করে? ওর টেবিলে অনেক বই দেখেছি। আমার বইও এক কপি এনেছে দেখলাম। সেই বই কল্যাণী পড়ছিল। যাকে পছন্দ হয় না, তার বই কি লোকে পড়ে! কিন্তু কল্যাণী তো আমাকে অপছন্দ করে না! সে তো নিজেই আমার কাছে এসেছে, ডেকে নিয়ে গেছে বেড়াতে। বলেছে, রোজ আমার সঙ্গে বেড়াবে। এত দিন একা কাটিয়েছে, আর সে একা বেড়াবে না।

জীবনেও তো সে একা। সেখানে কেন কাউকে চায় না!

ছি ছি, আবার আমি কল্যাণীর কথা ভাবছি!

শ্রীধর মণ্ডলের মামলাটা জটিল হয়ে উঠছে। লোকটা ভারি চালাক। সেই নিশ্চয়ই সমস্ত নষ্টের মূলে। এখন ভালমানুষ সাজছে। গলায় তুলসির মালা পরে কৃষ্ণনাম করলেই বৈষ্ণব হয়! একটা ভণ্ড।

ভণ্ড কে নয়! সমস্ত দুনিয়া আজ ভণ্ডামি করছে। ভেবেছিলাম কল্যাণী হয়তো ভণ্ডামি করবে না। কিন্তু সেও তো সেই রকম। আমাকেও ভণ্ড হতে বলছে। যাদের জন্য শীলা আত্মহত্যা করল, আমি তাদের ক্ষমা করব! সাহায্য করব তাদের বেঁচে থাকতে! শীলা তাদের একজন ছিল বলেই কি আমাকে এই অন্যায় করতে হবে, আশ্রয় দিতে হবে পাপকে!

নেতাজী মরে গেলেন, লোকে তাঁকে মেরে ফেলল। দেশের জন্য যে মানুষ তাঁর প্রাণ দিলেন, এ দেশের লোক তাঁকেই বলল, সাহায্য করব না, দেশে ফিরতে দেব না, লড়াই করব তোমার সঙ্গে। এ সব কথা সত্যি কিনা কে জানে, মিথ্যাই বা বলবে কেন! নেতাজী মরে গেলেন, কিন্তু দেশটা বেঁচে উঠল না! স্বার্থপরতার শেষ না হলে কি সত্য যুগ আসে না! কলির অবসান কবে হবে!

কল্যাণী বলেছিল, আমার কাছে তার সাহায্যের দরকার। অপদার্থ সংঘের খাতা থেকে পুলিশ তার নাম টুকে নিয়ে গেছে। আরও যাদের নাম নিয়ে গেছে, তাদের সবাইকে একে একে কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছে। কল্যাণীকেও কি কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে? কী জিজ্ঞেস করবে তাকে? সত্যিই তো, আমি যদি সাহায্য না করি, কে সাহায্য করবে তাকে! কিন্তু কল্যাণী কি এখন আমার সাহায্য নেবে! আমি তাকে অপমান করি নি তো! নিশ্চয়ই করি নি। আমি তো তাকে সম্মান দিতেই চেয়েছিলাম। সে কেন আমাকে ভুল বুঝল!

পর্দার আড়ালে কারও ছায়া দেখতে পেলাম। ও কার ছায়া! ও ছায়া তো ম্যানেজারের নয়। অনাদিবাবুরও নয়। ও ছায়া কি কোন বেয়ারার হবে! না কল্যাণী তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে! কল্যাণীই হবে। সেই বোধ হয় কিছু বলতে আসছে। কিন্তু ঘরে এল না কেন? সঙ্কোচ! তার কোন সঙ্কোচবোধ নেই বলে সে তো

অহংকার করে! কিন্তু ও জিনিস থাকতেই হবে। হাজার হলেও তো সে নারী!

আমি আমার চুরুটটা অ্যাশট্রের উপরে নামিয়ে রাখলাম। নিঃশব্দ পদক্ষেপে এলাম বাহিরে। না তো, বারান্দায় কেউ নেই। তবে কি আমি ভুল দেখলাম!

ভুল আমি দেখি নি। অন্ধকার থামের আড়ালে সে লুকিয়েছিল। কাছে গিয়ে বললাম: লুকোলে চলবে না। সোজা ঘরে চল।

তাকে ঘরে এনে আমি বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলাম। এ তো কল্যাণী নয়, এ অন্য কোন মেয়ে। কালো শাড়ির উপর পাঁশুটে রঙের ক্লোক পরেছে। টানা টানা সরু ভ্রু, কিন্তু মুখে রঙ নেই। তবু আমার মনে হল, এরই নাম মায়া। একেই আমি আজ পথের আলোয় দেখেছি।

মেয়েটি বড় জড়সড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বললাম: তোমার নাম কি মায়া?

মায়া মাথা দুলিয়ে বলল: হ্যাঁ।

বললাম: বস।

কিন্তু মায়া কেন এখানে এল! কল্যাণীর সন্দেহ যদি সত্য হয় তো নির্মল সেনের খোঁজ করতে নিশ্চয়ই আসে নি। তবে আর কী করতে সে এখানে আসবে! নির্মলের জন্য হলে কল্যাণীর সন্দেহ বলব অমূলক। আমরা দুজনেই বসলাম। মায়া কিন্তু সহজ হয়ে বসতে পারল না। খানিকক্ষণ সময় দিয়ে বললাম: কাকে চাই?

আপনাকে।

আমাকে!

আমি চমকে উঠেছিলাম তার কথা শুনে। সহসা এ কথা বিশ্বাস করতে পারলাম না। মনে হল, সে কোন সত্য গোপনের চেষ্টা করছে

মিথ্যা দিয়ে। মায়া তার যুক্তি বিস্তার করল : নির্মলকে আপনি বাঁচাবেন, এই আশায় আপনার কাছে এসেছি।

মিথ্যে কথা। এত রাত্রে কেউ মামলা নিয়ে উকিলের কাছে আসে না।

মায়া এ অভিযোগের উত্তর দিল না। শুধু মাথা নিচু করে বসে রইল।

বললাম : নির্মলকে তুমিই ধরিয়ে দিয়েছ, না?

মাথা না তুলেই মায়া বলল : হ্যাঁ।

কেন ধরিয়ে দিলে?

আমার কর্তব্য করেছি। আমি পুলিশের গোয়েন্দা ছিলাম।

ছিলাম মানে? এখন কি তুমি আর মাতাহারি নও?

না। চাকরিতে আমি ইস্তফা দিয়েছি।

মায়া তার পকেট থেকে একখানা কাগজ বার করল, তার পদত্যাগ-পত্র। বলল : পড়ে দেখুন।

পত্রখানি পড়ে আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হল। ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর কাছে জানিয়েছে যে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে মিথ্যাচরণ করতে বাধ্য করার জন্য সে তার চাকরিতে ইস্তফা দিতে বাধ্য হল। এই পত্র সে রেজেস্ট্রি ডাকে পাঠিয়েছে। পোস্ট অফিসের রসিদও দেখাল। মনে হল, এও কোন ছল নয় তো! বললাম : আমি বিশ্বাস করি না।

কিসে বিশ্বাস করবেন?

সত্য কথা যুক্তি দিয়ে বিশ্বাস করতে হয় না, দিনের আলোর মতো তা উপলব্ধির জিনিষ। তুমি কি নির্মলকে ভালবেসেছিলে?

জানি নে।

তবে যা জান তাই বল।

মায়া একবার ঘরের চারিদিকটা দেখল। তার পর দরজাটা ভেজিয়ে

দিয়ে বলল : এই ঘরে আমি অনেকবার এসেছি, অনেক কথা বলেছি নির্মলের সঙ্গে। সে সমস্ত কথা আরও একজন শুনে গেছে। ঐ জানালার নিচে দাঁড়িয়ে সব শোনা যায়, ওটা নির্মল খুলেই রাখত, অন্য-মনস্ক ভাবে বসে বসে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখত। আমি এলেও ঐ জানালাটা বন্ধ করতে দিতাম না। বিপিনবাবু বলে যে ভদ্রলোক আমার বাবা সেজেছিলেন, তিনি ঐ জানালার নিচে দাঁড়িয়ে আমাদের সব কথা শুনতেন। আমার ওপরওয়ালা তিনি, কাজেই আমি বাধ্য হতাম ঐ জানালা খুলে রাখতে। এক দিন খুলি নি। সে দিন ঐ দরজার পাশে এসে কর্তব্যটা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

মায়া একবার বন্ধ জানালা ও দরজা দুটোই পরীক্ষা করে দেখে এল। বললাম : তুমি কার কাছে এ সব বলছ জান ?

জানি। আমি ফৌজদারী আদালতের উকিল সঞ্জয় রায়ের সাহায্য-প্রার্থী। জানি, তিনি পাপীর প্রতি ক্ষমাহীন নির্মম। কিন্তু গভীর অনুশোচনায় পাপ যার ধুয়ে মুছে নিঃশেষ হয়ে গেছে, তাকেও কি আপনি ক্ষমা করবেন না।

সেই ক্ষমা! কল্যাণীও আমাকে একই কথা বলেছে! মেয়েদের জন্ম কি শুধু ক্ষমা করবার জন্যই! তবু আমি দৃঢ় থাকবার চেষ্টা করলাম। বললাম : কলকাতায় আরও অনেক উকিল আছে, উকিলের অভাব নির্মলের হবে না।

সে কথা মানি। কিন্তু সেখানে পৌঁছতে পারব কিনা জানি না। কুমীরের সঙ্গে লড়াই করে জলে থাকা যায় না। কাল সকালে আমার কী হবে ভগবানই জানেন!

কিছু যেন স্পষ্ট হচ্ছে, তার এই অন্ধকারের অভিযানের একটা অর্থ খুঁজে পাচ্ছি। বললাম : বল এইবারে।

ভয়ে ভয়ে মায়া বলল : কী বলব বলুন।

কেন তুমি নির্মলকে বাঁচাতে চাইছ, সেই কথা বল।

সব সত্যি বললে আপনি তাকে বাঁচাবার ভার নেবেন তো?

শর্তের কথা। মেয়েটা আমাকে দিয়ে আগে শর্ত করিয়ে নিতে চায়। সে পাপ করেছে কি করে নি, সে কথা জানাবার আগেই সে আমার সম্মতি চাইছে। কল্যাণী কিছু না জেনেই আমাকে এই অনুরোধ করেছিল। আর এ মেয়েটা জেনে করছে। সেই এক মন, সেই এক বাসনা। আমি কেন সমস্ত না জেনে রাজী হতে পারছি না! নির্মল অপরাধ করেছে শুনলে কি রাজী হতে পারব না! কেন পারব না! আমি উকিল, পাপ পুণ্যের বিচারের ভার তো বিচারকের উপর। আমি কেন এ সমস্ত দুর্ভাবনা ভেবে নিজের মনকে পীড়িত করি! তার চেয়ে—

না না, তা হয় না। কল্যাণীকে খুশী করবার জন্য আমি আমার মত বদলাতে পারব না। কল্যাণী তো নিজেই বলেছিল যে, দেশে একটা নূতন সমাজের সৃষ্টি হয়েছে। দেশের মাটিতে এ সমাজের জন্ম নয়। জাপানীরা আকাশ থেকে কিছু ফেলেছিল, বোমার বদলে কিছু মানুষ। বাকী এসেছিল জাহাজে চেপে। আমেরিকার জাহাজ। ইংরেজ এদের এই দেশের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত করে গেছে। তাদের জন্য আমার একটুও ক্ষমা নেই।

মায়া উঠে দাঁড়িয়েছিল। বলল: ভার যদি নাই নেন, তবে কেন আপনার কাছে নিজের মনটা মেলে ধরি।

যদি নিই?

নেবেন!

মায়া বসে পড়ল। অপূর্ব আবেশে উজ্জ্বল হল মায়ার সুন্দর মুখ। বলল: তবে আমি আপনাকে সব বলব। আপনার কাছে আমি কিছু লুকোব না।

ভাল করে গুছিয়ে বসে মায়া তার কাহিনী শোনাল আমাকে।—তারা

লালবাজারের লোক। মায়া আর বিপিনবাবু তাদের নেওয়া নাম। আসল নাম এখন গোপনই থাক। মনোজ মিত্রের মামলায় খুনী বলে একটা লোককে পুলিশ দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। মনোজ মিত্র যে ঘরে খুন হয়েছে, তার পাশের ঘরে ঐ লোকটাকে অচেতন অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। নেশা একটু বেশি করে বাড়ি ফিরতে পারে নি। কিন্তু মামলা দাঁড়াচ্ছে না, সাক্ষী-প্রমাণ তার বিরুদ্ধে কিছুই নেই। মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে একটা খুনের মামলা সাজানো কঠিন কাজ।

নির্মল সেনের সঙ্গে মনোজ মিত্রের অন্তরঙ্গ ভাব ছিল। কিন্তু এই রকমের ভাব থাকলে একজন আর-একজনকে খুন করতে পারে না, পুলিশ তা মনে করে না। বরং মেয়ে নিয়ে কিংবা পয়সার বখরা নিয়ে এই জাতের এক বন্ধু আর-এক বন্ধুকে ঠাণ্ডা মাথায় হামেশাই খুন করছে। এও যে একটা পরিকল্পিত খুন তাতে সন্দেহ ছিল না। কেননা, যে খুন করেছে সে কোন বেহিসেবী হদিস রেখে যায় নি।

খুনটা একটু বেশি রাতে হয়েছিল, অথচ খোঁজ নিয়ে দেখা গেল যে প্রথম রাতের দার্জিলিঙ মেলে নির্মল কলকাতা ছেড়েছে। তার বার্থ রিজার্ভড ছিল, এবং ট্রেণের সময় তাকে স্টেশনেও দেখা গেছে। নির্মলের লিভারটা খারাপ হয়েছিল, এবং চিকিৎসাও করাচ্ছিল কিছু দিন থেকে। তার হাওয়া বদলের প্রয়োজনটা অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু পুলিশ তবু তাকে সন্দেহের চোখে দেখেছে। আমাদের দেশের মেয়েরা এখনও এ ধরণের খুন করতে শেখে নি। আত্মরক্ষার জন্য বা ইজ্জতের জন্য কিংবা দেশের জন্যও হয়তো তারা হত্যা করতে পারে, কিন্তু এ রকমের প্রতিহিংসা নিতে পারে না। পুরুষে পারে। মনোজ মিত্রের কাছে নির্মল সেন সমস্ত ব্যাপারে হেরে যায়। নির্মলের পয়সায় মনোজ ভোজ খেয়ে এঁটোকাঁটা ফেলে দেয় নির্মলের সামনে। তবু দিত। ইদানীং সে সব বন্ধ করেছিল। একটা মেয়েকে বিয়ে করে

মনোজ নাকি সংসারী হবার চেষ্টা করছিল। নির্মলের তা ভাল লাগে নি।

বিপিনবাবুর উপর ভার পড়ল নির্মলকে বাজিয়ে দেখবার। তিনি মায়াকে সঙ্গে নিলেন। পুরুষকে মেয়ে যেমন বাজাতে পারে, পুরুষে তেমন পারে না। মামলা চলছে। খুব তাড়াতাড়ি আমাদের রিপোর্ট চাই। উড়োজাহাজে আমরা উড়ে এলাম। দার্জিলিঙের পুলিশও জানল না যে আমরা দুজনে এখানে তদন্তে এসেছি।

বিপিনবাবু আমাকে বললেন : মাতাহারি দেখেছ? বিদেশী মেয়ে-গোয়েন্দার কাহিনী?

দেখেছি।

কেমন লেগেছিল গ্রেটা গার্বোকে?

আমি হেসে বলেছিলাম : মনে আছে।

বিপিনবাবু আমাকে উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন : তোমার মোটা পুরস্কারের ব্যবস্থা হবে, প্রমোশনও হবে।

প্রমোশন ও পুরস্কারের লোভে মায়া নির্মলের সঙ্গে ভাব করতে এগোল।

রাত্রির গভীরতা সম্বন্ধে মায়া সচেতন ছিল। বলল : আপনি যদি বিরক্ত না হন, তাহলে আমি খুঁটিনাটি কথাও বলতে পারি। সমস্ত আমার মনে আছে।

সমস্ত বলাই ভাল। সব কিছু জানবার বাসনা আমার হয়েছে।

পরিচয়ের প্রথম দিন থেকে মায়া গল্প শুরু করল।

নির্মলকে খুঁজে বার করতে তাদের বেশি সময় লাগে নি। হোটেলের নাম তারা কলকাতাতেই জেনে এসেছিল। লালবাজারের খাতায় লেখা আছে। তার ছবিও দেখেছি সেখানে। বিকেলে তারা নির্মলকে অনুসরণ করে বার্চ হিলে এল।

নির্মল একটা বেঞ্চিতে বসেছিল। পাইপ ধরিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছিল। সামনে ছেলেমেয়েদের খেলার বিশ্রাম নেই। কেউ 'সি-স'র উপর চেপে ঢেঁকি ঢেঁকি খেলছে, কেউ দোলনায় দুলছে বিপর্যস্ত ভাবে, কেউ বা মই বেয়ে উপরে উঠে সর সর করে নেমে আসছে বিপুল বেগে। নির্মলের মুখ ছিল এই খেলার দিকে, কিন্তু দৃষ্টিটা আত্মস্থ, বেশ চিন্তাগ্রস্ত। নির্মল জানত না যে এখানে কেউ তাকে লক্ষ্য করছে। টের পেলে নিশ্চয়ই সে উঠে যেত।

মায়ারা ওধারের বেঞ্চে এসে বসল। মায়া আর বিপিনবাবু! পরচুলা পরা বিপিনবাবুকে ঠিক চেনা যাচ্ছে না। মাথায় একটা ব্যালাক্লাভা টুপি দিয়েছেন। দিনের বেলায় ধরা পড়বার ভয় কম। নির্মলের সঙ্গে কী করে আলাপ করা যায়, দশজনের শ্রবণ বাঁচিয়ে আমরা সেই কথা আলোচনা করছিলাম।

বিপিনবাবু এক সময় নির্মলের কাছে উঠে গেলেন। তার বেঞ্চির একটা ধারে বসে একটুখানি কাশলেন। এই শব্দটুকুতেই তাঁর উদ্দেশ্য সফল হল। নির্মল চমকে উঠে সোজা হয়ে বসল। চিন্তার জগৎ থেকে সে বাস্তবে ফিরে এল।

বিপিনবাবু বললেন: বিরক্ত করলাম না তো?

বিরক্ত!

বিরক্তই তো, একা বসে আপনি হয়তো কত কী ভাবছিলেন—

নির্মলের দৃষ্টি হঠাৎ কঠিন হল, বলল: কে বলল আমি কত কী ভাবছি?

আমরা যে রোজ আপনাকে লক্ষ্য করছি।

রোজ?

কোন অপরিচিত ব্যক্তির এই অহেতুক কৌতূহল নির্মল সৌজন্যহীন অভদ্রতা বলে মনে করে। একটা কঠিন উত্তর দিতে গিয়েও থেমে গেল।

বিপিনবাবু বললেন ঃ মায়ার ধারণা আপনি বাঙালী নন, আর আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

বলেই তিনি মায়াকে ডাকলেন।

মায়া এই আহ্বানের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল। শাড়ির আঁচলখানা সামনের দিকে টেনে এগিয়ে এল। বিপিনবাবু বললেন ঃ কার কথা ঠিক হল এইবারে দেখ। ভদ্রলোক একেবারে খাঁটি বাঙালী। গায়ে পড়ে কথা কইছি বলে রাগ করছেন।

দুহাত জুড়ে মায়া নির্মলকে নমস্কার করল ঃ রাগ করবার কথাই যে।

কেন ?

আপনি হয়তো কোন গুরুতর সমস্যার কথা ভাবছেন—

সেই এক কথা। নির্মল বাধা দিয়ে বলল ঃ একা একা হাসতে শুরু করলে কি আপনারা পাগল ভাববেন না ?

মায়া নির্মলের পাশেই বসে ছিল। পুলকে উচ্ছসিত হয়ে হেসে উঠল। বলল ঃ সে আরও কৌতুকের হত।

এই হাসিতে নির্মলের উষ্মা অনেক নেমে গেল। বিপিনবাবু তা লক্ষ্য করে বললেন ঃ আপনার চোখে মুখে দার্শনিকের মতো গাম্ভীর্য, তাই দেখেই আমরা আলাপে ভয় পেয়েছি।

মায়া বলল ঃ বাবাকে আমিই সাহস দিয়েছি। বাবার চেহারাই বা দার্শনিকের মতো নয় কিসে !

এবারে নির্মলও হাসল।

বেলা শেষের এই সোনালি রোদে বুঝি একটু নেশা আছে। মেঘে যেটুকু জল ছিল, তা ঝরে গেছে। এখন শুধু নির্জলা রোদ। পাহাড়ি পরিবেশে এই উত্তাপেই তো নেশা ঘনায়।

বিপিনবাবু বললেন ঃ এত মানুষ থাকতে বসে বসে আপনাকে কেন লক্ষ্য করেছি, তার কারণ বলি। আপনি আমাদের পাশের হোটেলেই

আছেন, আর বেরোন প্রায় আমাদের সঙ্গেই। কোন দিন আগে, কোন দিন পেছনে। কোন সঙ্গী নেই, কথাও বলেন না কারও সঙ্গে।

মায়া বলে উঠল : কথা না বলে আমরা এক মুহূর্ত থাকতে পারি নে।

গভীর বিস্ময়ে নির্মল বলল : আমি আপনাদের এক দিনও লক্ষ্য করি নি।

মায়া বলল : করেছি আমি।

হাসতে হাসতে বিপিনবাবু বললেন : মেয়ে আমার—

নির্মল কথাটা শেষ করল : ভাল গোয়েন্দা হতে পারতেন।

মায়া এ কথায় চমকে উঠেছিল, তার পরে সহজ হয়ে বলল : কোন কাজ আছে কি আপনার খোঁজে, কোন ডাকাতি বা খুনের তদন্ত ?

এবার নির্মল চমকাল। একান্ত অন্যমনস্ক ভাবে বলল : না না, এ আমার ঠাট্টার কথা।

বিপিনবাবুর দৃষ্টিটা যে শ্যেনের মতো, নির্মল তা লক্ষ্য করে নি।

বাড়ি ফেরবার পথে তাদের পরিচয় হল। মায়ার বাবা বিপিনবাবু উত্তরবঙ্গের এক আদালতে ওকালতি করেন। সরকার উকিলদের অবসর নিতে বাধ্য করেন না। তাই তিনি এখনও কাজ করছেন। বক্তৃতার ক্ষমতা ফুরিয়েছে বলে এখন শুধু পরামর্শ দেন। চারি দিকে চা বাগানগুলো চলছে বলে তিনিও চলছেন। নইলে বিপদে পড়তে হত।

নির্মল আশ্চর্য হচ্ছিল। সম্পূর্ণ অপরিচিতের কাছে কি নিজের অসচ্ছলতার কথা এমন অকপটে বলা যায়! অপরিচিতের কাছেই বুঝি যায়।

বিপিনবাবু মায়ার কথাও বললেন। মায়া তাঁর একমাত্র সন্তান নয়। তাঁর শেষ সন্তান। আর-সব ছেলেমেয়েরা বিয়ে-থা করে ঘোর সংসারী

হয়েছে। বাপের শেষ জীবনে এ মেয়ে ছাড়ছে না, ছায়ার মতো সর্বত্র ঘুরছে। মৃত্যুর আগে কি মায়াকে পাত্রস্থ করতে পারবেন না!

বিপিনবাবুর চোখ দুটো হঠাৎ ছল ছল করে উঠল।

নির্মল বুঝি অভিভূত হল। আত্মদানে যে নারী মহিমময়ী, নির্মল কি তারই একজনকে নিজের নিকটে দেখছে! পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে সে মায়ার দিকে তাকাল। সায়াহ্নের সুন্দর আকাশের মতোই কি এই মেয়েটি রূপে রঙে রঞ্জিত হয়ে আছে! মায়ার মনে হল, নির্মল তাকে শ্রদ্ধা করতে শিখল সহজ ভাবে।

দুপুরের আহারের পর নির্মল তার নিজের ঘরে ফিরে এসেছিল। উত্তরের জানালা খুলে দিয়ে গভীর মনোযোগে পড়ছিল দৈনিক সংবাদপত্র। কাগজখানা কখন তার হাত থেকে খসে পড়ে গেছে খেয়াল করে নি। দুরন্ত ভাবনায় সে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাচ্ছিল।

খোলা জানালা দিয়ে নির্মল বাহিরে চেয়ে ছিল। দিগন্তে জেগে আছে রৌদ্রোজ্জ্বল কাঞ্চনজঙ্ঘার উদার বিস্তার। হঠাৎ এক খণ্ড মেঘ এসে রৌদ্রকে ঢেকে দিল। একটা গাঢ় নীল ছায়া এল সামনের দিকে এগিয়ে। নির্মল চমকে উঠল, অতর্কিতে দেহটা উঠল থরথর করে কেঁপে।

মায়া কখন এসে তার পিছনে দাঁড়িয়েছিল, নির্মল খেয়াল করে নি। তার কথা শুনে আর একবার চমকে উঠল। মায়া প্রশ্ন করেছিল : কী হল, অমন চমকে উঠলেন যে?

নির্মলকে বড় অসহায় দেখাল। যেন তার একটা গভীর অপরাধ হঠাৎ ধরা পড়ে গেছে। মুখে তার কথা যোগাল না।

মায়া বলল : স্বপ্ন দেখছিলেন বুঝি?

নির্মল হয়তো স্বপ্নই দেখছিল, তার প্রিয়তম বন্ধু মনোজের হত্যার দুঃস্বপ্ন। মানুষ খুন হতে সে কখনও দেখে নি। খুন হবার পরেও না। শুধু কাগজে পড়েছে, আর গল্প শুনেছে। কিন্তু এখন সে চোখ বুজলেই

রক্ত দেখতে পায়। দেখে, তাদের সংঘের একটা ঘরে মনোজ লুটিয়ে পড়ে আছে। মাথার খুলিটা ভেঙ্গে মগজ গড়িয়ে পড়ছে সাদা আর গোলাপী রঙের। আর রক্ত। অন্যমনস্ক হলেই নির্মল চমকে ওঠে।

মায়া তখনও তার উত্তরের অপেক্ষা করছে। কিন্তু নির্মলের কথা সব এলোমেলো হয়ে গেল ঃ স্বপ্ন। হ্যাঁ, না, স্বপ্ন কেন দেখব !

মায়া নাছোড়বান্দা। বলল ঃ বাইরে থেকে দরজায় টোকা দিয়ে, ডেকে আপনার সাড়া পেলাম না। ভাবলাম, অবেলায় ঘুমোচ্ছেন, জাগিয়ে দেব। কিন্তু আপনি জেগেই ছিলেন, খুব অন্যমনস্ক।

নির্মলকে এ কথা স্বীকার করতে হল। কিন্তু কথা না বলে সে শুধু মাথা নাড়ল।

মায়া এগিয়ে এসে একখানা চেয়ারে বসল। হাসতে হাসতে বলল ঃ আমার চেহারাটাই বোধ হয় পেত্নীর মতো। তাই ছায়া দেখেই চমকে উঠেছিলেন।

মায়ার হাসিটা বোধ হয় নির্মলের ভাল লাগছিল। বলল ঃ প্রশংসা শোনার বাসনা মেয়েদের সনাতন।

কিন্তু এখনও সে সহজ হতে পারে নি, এখনও তার মনে চলেছে দুরন্ত চিন্তার প্রতিক্রিয়া। সুযোগ পেয়েও সে সহজ হতে পারল না। নিঃশব্দে সে হাসল, প্রাণহীন শুষ্ক হাসি।

মায়া মেঝের দিকে চেয়ে খবরের কাগজটা দেখে নিয়েছিল। খোলা পাতার উপরেই মনোজ মিত্রের হত্যার মামলা। নির্মলকেও দেখল মনস্তাত্ত্বিকের অন্তর্ভেদী গভীর দৃষ্টি দিয়ে। লোকটার আচরণ সত্যিই অদ্ভুত। তা না হলে এমন গম্ভীর হয়ে থাকতে কেন ভালবাসবে !

মায়া মেঝের কাগজখানা তুলে পাট করে রাখল। তারপর ছেলেমানুষের মতো প্রশ্ন করল ঃ এবারে বেড়াতে বেরোবেন তো, না এমনি করে ঘরে বসেই বিকেলটা কাটাবেন ?

নির্মল তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। বলল : সত্যিই খুব দেরি হয়ে গেছে।

দেরি এমন আর কী হয়েছে! কিন্তু আপনি তো এখনও চা খান নি!

চা!

মায়া হেসে বলল : বেয়ারা চা নিয়ে ফিরে গেছে। আমার মতো বেহায়া নয়তো, সাড়া না পেয়ে ঘরে ঢোকবার সাহস পায় নি।

মায়া বোধ হয় বেয়ারাকে ডাকতে যাচ্ছিল। তার দরকার হল না। বাহির থেকে সাড়া দিয়ে সে নিজেই ভিতরে এল।

চা খেয়ে পথে বেরোতে তাদের বেশি দেরি হল না। নির্মল বলল : আজকাল আপনার বাবা আসেন না তো?

মায়া হেসে বলল : তাকে তাসে পেয়েছে ভূতে পাবার মতন। হোটেলের ঘরেই দিন-রাত জাঁকিয়ে আছেন। তাসের সঙ্গে যত পয়সা পড়ছে, নেশাও তত ঘনিয়ে উঠছে।

নির্মল যেন আঁতকে উঠল। তারাও যখন অপদার্থ সংঘ খুলেছিল, তখন চা আর তাস দিয়ে সংঘের উদ্বোধন হয়। তারপর এল পাশা আর লেমনেড। সকলের শেষে মদ আর মেয়ে। জুয়ার আড্ডা সরগরম হল, মাতলামি থিতিয়ে উঠল ভিতরে ও বাহিরে। সুযোগ বুঝে বাজে মেয়েরাও এল রোজগারের লোভে। এই অতীতটাকে নির্মল ভয় পায়, ও সব বাদ দিতে পারলে তার জীবনটা আজ অন্য রকম হত।

নির্মলের এই চমকানিটা মায়া লক্ষ্য করেছিল। কিন্তু এই নির্বিকার লোকটাকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই! শুধু সময় নষ্ট করা বই তো নয়।

চলতে চলতে মায়া অন্য কথা জিজ্ঞাসা করল : কী ভাবছেন?

অন্যমনস্ক ভাবে নির্মল বলল : স্বাস্থ্য মানুষের মস্ত বড় সম্পদ।

মায়া এ কথার সূত্র খুঁজে পেল না। বলল : হঠাৎ এ কথা কেন ?

এই কথাই যে এখন বার বার মনে হয়। আয়নায় আমার নিজের চেহারা দেখে আমি চমকে উঠি। এমন খারাপ স্বাস্থ্য আমার কোন দিন ছিল না। এখন যেন একখানা কঙ্কাল বয়ে বেড়াচ্ছি।

মায়া এ সবই লক্ষ্য করেছে। কারণও জানতে চেয়েছে অনেক বার অনেক ভাবে। কিন্তু উত্তর পায় নি। এবারে আর প্রশ্ন করে নির্মলকে বাধা দিল না। বরং নীরব থেকে তাকে বলবার সুযোগ দিল।

নির্মল আজ প্রগল্ভ হল, বলল : আমি এমন ছিলাম না মায়াদেবী। অপদার্থ সংঘে আমার চেয়ে বড় অপদার্থ আর ছিল না। কতকগুলো অলস বিলাসী ধনী অপদার্থকে নিয়ে যখন এই সংঘটা গড়ে তুলি, তখন এর ভবিষ্যৎটা দেখতে পাই নি। সেদিন উচ্ছৃঙ্খল যথেচ্ছাচারকে নির্ভীক পৌরুষ বলে শ্রদ্ধা করেছি। সামাজিক নীতি ও চারিত্রিক দৃঢ়তাকে কুসংস্কার বলে বেপরোয়া নিন্দা করেছি। পিতা পরোক্ষে প্রশ্রয় দিয়েছেন, নির্বিকার চিত্তে অর্থ জুগিয়েছেন অকুণ্ঠ হাতে।

একটু থেমে বলল : ঘরে আর কেউ ছিল না যে বাধা দিতে পারত। মাকে হারিয়েছিলাম জ্ঞান হবার আগেই। জননীর শাসনে স্নেহে প্রহারে ও প্রশ্রয়ে আর দশটা শিশুর চরিত্র যে ভাবে গড়ে ওঠে, আমার বেলায় তা হল না। যে আদর্শ অলক্ষ্যে থেকে অনাচারকে একটা আতঙ্ক দিয়ে ঘিরে রাখে, সে আদর্শ আমার জীবনে প্রতিফলিত হল না। বাবা যখন বিয়ে করতে বললেন, আমি তখন নারীর বাইরের রূপ দেখে চিনে ফেলেছি। জীবনের সঙ্গী করে নেবার মতো কোন প্রলোভন তার মধ্যে খুঁজে পাই নি।

আজ তারা জলাপাহাড়ের পথ ধরেছিল। সূর্য অস্ত গেছে, কিন্তু অন্ধকারে গভীর হয় নি। বাড়ি ফেরার সময় হয়ে থাকলেও মায়া আজ

বসবার প্রয়োজন বোধ করল। রাস্তার ধারে একটা টিনের চালা দেখে বলল: বেঞ্চিতে একটু বসা যাক।

নির্মল দাঁড়িয়ে পড়ল, তার ধ্যান যেন ভেঙে গেছে। বলল: আমি অত্যন্ত দুঃখিত মায়াদেবী—

মায়াদেবী নয়, শুধু মায়া।

নির্মল হাসল, বলল: অন্যমনস্ক ভাবে অনেক দূর চলে এসেছি। অন্ধকারে আর এগোন উচিত হবে না।

কিন্তু মায়া তখনই ফিরতে রাজী হল না, বলল: একটু জিরিয়ে নিই, তার পর ফিরব।

মায়াকে অনুসরণ করে নির্মল এসে বেঞ্চিতে বসল। কিন্তু কথা কইল না। কিন্তু মায়া আজ সব কথা শুনতে চায়। বলল: তারপর?

নির্মল তার গল্পের সূত্র হারিয়ে ফেলেছে। বলল: কী তারপর?

আপনি বিয়ে করতে রাজী হলেন না।

নির্মল ভাবল খানিকক্ষণ, তারপর বলল: আমার অত্যাচারের জীবন আজ শেষ হয়ে গেছে। আজ ভাবি, আমিও তো খুন হতে পারতুম মনোজের হাতে।

সমস্ত স্নায়ু একত্র করে মায়া শক্ত হয়ে বসল। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির দিকে চোখ পড়তেই নির্মল থেমে গেল।

অনেক প্রত্যাশা নিয়ে মায়া তাকিয়ে ছিল। তবু নির্মল উঠে দাঁড়াল, বলল: চলুন, এবারে ফেরা যাক।

দিন কয়েক পরের কথা। এই কটা দিনের কথা মায়া বলবে না, বলতে পারবে না। সে নিতান্তই তার নিজের কথা, মায়া আর নির্মলের কথা। মায়ার জীবনে তা অক্ষয় হয়ে থাকবে, উজ্জ্বল হবে; ম্লান হবে না কোন দিন।

এক দিন নির্মল বলল : আমাদের হোটেলে একজন মেয়ে মাস্টার আছে। সে তোমার সম্বন্ধে কী বলতে এসেছিল জান ?

মায়া তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল পরের কথাটির জন্য।

নির্মল বলল : আমাকে সাবধান করতে এসেছিল। বলেছিল, মায়া মেয়েটার আচরণ খুবই সন্দেহজনক, ওকে বিশ্বাস করবেন না।

বলে নির্মল হা-হা করে হাসল।

বেদনায় মায়ার বুকের ভিতরটা সেদিন মুচড়ে উঠেছিল।

এ সব দুর্বলতার কথা থাক। মায়া শেষ দিনের কথা বলে তার কাহিনী শেষ করবে। অনেক দিনের পুরনো কাহিনী নয়, এ ঘটনা আজ দুপুরবেলায় ঘটেছে।

আকাশে তখন মেঘের আড়ম্বর। দুপুরের রোদ মেঘে ঢাকা পড়তেই শিরশির করে উঠল মায়ার সারা দেহ। পাহাড়ের নিচে থেকে অবিরত মেঘ উঠছে। বৃদ্ধেরা জানালা বন্ধ করে দিলেন, মাফলার দিয়ে ঢাকলেন কান দুটো। লাল-নীল ছাতা হাতে মেমসাহেবরা বেরিয়ে এলেন নির্জন রাস্তার উপরে। মায়ার মনটাও দুলে উঠল। কেন দুলল, সেই জানে। শ্যাওলা রঙের একখানা শাড়ির উপরে এই পাঁশুটে ক্লোকটা চাপিয়ে সেও বেরিয়ে পড়ল। তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে ঠেলে উঠল পাশের হোটেলটায়।

দরজার শার্সিতে টোকা দিয়ে নির্মলের সাড়া পাওয়া গেল না। পর্দা সরিয়ে মায়া ঘরে ঢুকে পড়ল। নির্মল ঘুমচ্ছিল। তার বুকের উপর খবরের কাগজটা ছড়িয়ে পড়ে আছে। মায়া নির্মলকে জাগাল না, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল এই মানুষটাকে। বুঝতে পারল যে তার দৃষ্টিতে নেই ক্রূর হিংসা। শিকারের উপর লাফিয়ে পড়বার আগে জানোয়ার যে চোখে তাকায়, সে দৃষ্টি তার নিবে গেছে। এই অসহায় মানুষটার জন্যে এক রকমের অদ্ভুত মায়া জাগে।

নির্মলের ডান হাত দিয়ে কাগজখানা চাপা ছিল। মায়া তা মুক্ত করে নিল।

সেই মামলা। কিন্তু মায়া আজ বড় অস্থির বোধ করছে। ঘরের কোণের আরাম চৌকিটায় বসে কাগজখানা পড়তে লাগল। কে এক গণেশ হালদার তার জবানবন্দীতে নির্মলের নাম করেছে। বলেছে, জল ঝড় উপেক্ষা করেও যারা প্রতি সন্ধ্যায় সংঘে আসত, তারা দুজনেই সে দিন অনুপস্থিত ছিল। নির্মল সেন আর মনোজ মিত্র।

কাগজখানা সরিয়ে রেখে মায়া ভাবতে লাগল। এইবার হয়তো নির্মলের ডাক পড়বে। অসুস্থ শরীর নিয়েও তাকে পুলিশ ও আদালতের সামনে দাঁড়াতে হবে, খুনের মামলার সামান্য খবর বলে সাধারণে যা উপেক্ষা করে, পুলিশের তদন্তের জন্য সেইটেই হয়তো সব চেয়ে প্রয়োজনীয় সংবাদ।

এক সময় মেঘের আড়াল থেকে একটা শব্দ ভেসে এল—উড়ো-জাহাজের পাখার শব্দ। এই বাদলার দিনে কার শখ হল ওড়বার, এই ভেবে মায়া আশ্চর্য হল। জগতে পয়সাওয়ালা পাগলের তো অভাব নেই।

মায়া জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মেঘে মেঘে কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়াগুলো আজ আড়াল হয়ে গেছে। উড়ো-জাহাজও দেখা যাচ্ছে না। কাচের জানালা খুলে দিতেই অনেকক্ষণের অবরুদ্ধ মেঘ দুরন্ত ভাবে ঘরে ঢুকে পড়ল। শিরশিরে ঠাণ্ডা ধোঁয়ার মতো ভিজে মেঘ। মায়া তাড়াতাড়ি আবার জানালাটা বন্ধ করে নিজের জায়গায় ফিরে এল।

উদ্দেশ্যহীন ভাবে মায়া বসে নেই। হয়তো কিছু ভাবছে। বিপিনবাবুর কথা ভাবছে। ভদ্রলোক বড় বেশি তাড়া দিচ্ছেন। ভয় দেখাচ্ছেন। মায়া বড় বেশি সময় নিচ্ছে বলে অসন্তোষ প্রকাশ করছেন। মায়ারও আর ভাল লাগছে না। এই লুকোচুরির জীবনে কোন স্বাদ নেই।

মায়া সোজা হয়ে বসল। বিপিনবাবু ঠিকই বলেছেন, আগুন নকল হলেও ও নিয়ে খেলা করতে নেই। প্রেম প্রেম খেলা, বড় সাংঘাতিক খেলা। যত তাড়াতাড়ি পার, ও খেলা শেষ কর।

ছি ছি, বিপিনবাবু কি মায়াকে সন্দেহ করতে শুরু করেছেন! মায়া তো আজ নতুন চাকরি করতে আসে নি। এ খেলা না হয় প্রথমই হল। আর খুনের আসামীকে কেউ কি ভালবাসে, যার জীবনের দিন গোনা হয়ে আছে! পাকা গোয়েন্দা হয়ে বিপিনবাবু এ ভুল কী করে করছেন!

ব্যস্ত ভাবে মায়া উঠে দাঁড়াল, উঠে গেল ঘরের আর-একটা কোণায়। সেখানে নির্মলের স্যুটকেশ আর হোল্ড অল গোটানো আছে। তৎপর হাতে মায়া সেই স্যুটকেশের লেবেল পরীক্ষা করল। তারপর হোল্ড অলটা নেড়ে চেড়ে সেটারও লেবেল বার করল। গর্বে মায়ার দুচোখ উঠল ঝিকমিকিয়ে। তারপরেই চমকে উঠল নির্মলের চীৎকারে।

নির্মল ঘুমের ঘোরে চেঁচিয়ে উঠেছে, আতঙ্কে আর্তনাদ করে ওঠবার মতো। তার দেহটাও কেঁপে উঠেছিল থর থর করে। মায়া ছুটে এসে দেখল, বিন্দু বিন্দু ঘামে তার কপাল ভিজে গেছে। উত্তেজনার শ্রান্তিতে সে তখনও হাঁপাচ্ছে।

মিনিট কয়েকের জন্য মায়া বেরিয়ে গেল। একটা বেয়ারাকে কফির ফরমায়েস করে নির্মলের কাছে এসে বসল। কম্বলে তার পা দুটো ঢেকে দিয়ে নিজের ডান হাতটা রাখল তার কোলের উপর।

বাহিরে তখন শিপ শিপ করে বৃষ্টি নেমেছে, তার ছিটে এসে পড়ছে কাচের জানালার উপর। নির্মল শুয়ে শুয়ে তাই দেখতে লাগল।

এক সময় মায়া একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেলল। বলল: তোমার ঘরের দরজাটাই শুধু খুলে রেখেছ নির্মলবাবু, মনেরটা কি কোন দিন খুলবে না?

নির্মলের গভীর দৃষ্টি স্থির হল মায়ার ম্লান মুখের উপর। মেয়েদের মন নিয়ে নির্মল অনেক ছিনিমিনি খেলেছে, কিন্তু এ কথা কোন দিন ভাবে

নি। এ রকম প্রশ্নের জবাব তাকে কারও কাছে দিতে হয় নি। নির্মল বিচলিত হল।

হোটেলের বেয়ারা এই সময় কফির ট্রে না আনলে নির্মলকে আরও বেশি পীড়িত হতে হত। মায়া তাকে অব্যাহতি দিল। এক পেয়ালা কফি ঢেলে বলল ঃ এই নাও।

অনেকক্ষণ পরে মায়া আবার কথা কইল। বলল ঃ আর বোধ হয় তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।

কেন ?

কলকাতা থেকে জরুরি তার এসেছে, দিদি ডেকে পাঠিয়েছে।

দিদি কেন ডেকে পাঠিয়েছে, মায়া তা বলল না। নির্মলও জানতে চাইল না। দিদি আর একবার মায়াকে ডেকেছিলেন। ভাল পাত্র আছে, তারা দেখবে। এবারেও বোধ হয় তাই। কিংবা অন্য কিছু।

মায়া বলল ঃ পাকিস্তানের ভেতর দিয়ে যেতে আমার আজকাল ভয় করে। সকরিগলি ঘাট হয়ে ঘুরে যেতে কষ্টের সীমা নেই।

নির্মল বলল ঃ প্লেনে যাচ্ছ না কেন ?

মায়া খুশিতে ঝলমল করে উঠল ঃ ঠিক বলেছ, প্লেনের কথা আমার মনেই ছিল না।

ভারত বিভক্ত হবার পর নূতন বিমানঘাঁটি খোলা হয়েছে বাঘডোকরায়। পাকিস্তানের ভিতর দিয়েও যাতায়াত তখনও নিষিদ্ধ হয় নি। কিন্তু রেলে যাঁরা ভয় পান, তাঁরা বিমানে উড়ে আসছেন। তারপর মোটরে উঠছেন দার্জিলিঙে।

কিন্তু টিকিট পেতে অসুবিধে নেই তো ?

নির্মল বলল ঃ কলকাতায় শুনেছি অসুবিধে হয় না।

তবে হয়তো ফিরেও আসতে পারব।

বলে আর এক পেয়ালা কফি ঢালল। নিজে নিল, নির্মলকেও দিল।

তারপর বলল : আজ তুমি নিশ্চয়ই কোন দুঃস্বপ্ন দেখেছ। কিছুতেই অস্বীকার করতে পারবে না।

নির্মল এবারে স্বীকার করল, বলল : হ্যাঁ।

মায়া তার চোখের দিকে চেয়ে আছে। তাই দেখে নির্মল বলল : সত্যিই দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম।

মায়া আরও বেশি জানতে চায়, বলল : তুমি বড়ই চাপা স্বভাবের।

নির্মল হেসে বলল : অসুস্থ কিনা, তাই কথা কইতে ভয় পাই।

কেন ?

কী বলতে কী বলে ফেলব—শেষে হয়তো অসুখটাই বেড়ে যাবে।

মায়া হাসল।

লজ্জা পেয়ে নির্মল বলল : স্বপ্নে আজ মনোজকে দেখছিলাম, সে আমার চার পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর বলছে, একা মদ খেতে তার আর ভাল লাগছে না। আমাকে কাছে পেতে চায়, যেমন আগে ছিলাম।

মায়া নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে।

নির্মলের চোখ দুটো হঠাৎ ঘোলাটে হয়ে গেল। পাথরের চোখের মতো দৃষ্টিহীন স্থির। তবু মায়া কথা কইল না।

নির্মল হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, বলল : আমি পাগল হয়ে যাব মায়া, আমি আর সইতে পারছি না। চোখ বুঁজলেই আমি একটা কাঠের খুঁটি দেখতে পাই, সাদা আর কালোয় ডোরা কাটা তার রঙ। একটা বালির বস্তা ঝুলিয়ে দড়িটা মজবুত কিনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। এ একটা বিভীষিকা মায়া, এর হাত থেকে নিষ্কৃতি না পেলে আমি সত্যিই পাগল হয়ে যাব।

এর পরে মায়া তার কর্তব্য শেষ করল। সদলবলে বিপিনবাবু এসে নির্মলকে ধরে নিয়ে গেলেন।

তারপর ?

তারপর আর কী! নিজে হাতে নির্মলকে আমি ফাঁসি কাঠের দিকে ঠেলে দিয়েছি। লিখে দিয়েছি, নির্মল ট্রেনে আসে নি দার্জিলিঙে, এসেছে উড়োজাহাজে উড়ে। বাক্স আর বিছানায় তার প্রমাণ আছে। একেবারে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছে, তাইতেই ফাঁকি দিতে পেরেছে সবাইকে। সব সত্য লিখেছি, একটুও গোপন করি নি। কিন্তু—

কিন্তু কী ?

সব চেয়ে বড় সত্যটাই আমি লিখতে ভুলে গেছি।

বুঝলাম। কিন্তু এত বড় পাপকে তুমি প্রশ্রয় দেবে ?

দৃঢ় কণ্ঠে মায়া বলল : নির্মল তো পাপ করে নি সঞ্জয়বাবু, খুন করে সে মানুষ হয়েছে। মনোজকে হত্যা না করলে সে নিজে কোন দিন মানুষ হতে পারত না।

আমার হাসি পেল তার কথা শুনে, কিন্তু তার বিশ্বাসের পরিমাণ দেখে হাসতে সাহস পেলাম না।

আমাদের হোটেলে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, হয়তো গোটা দার্জিলিঙ সহরটাই পড়েছে ঘুমিয়ে। জেগে জেগে আমরা দুজনে জীবনের খেই খুঁজছি।

অনেকক্ষণ পর মায়া বলল : নির্মলকে আপনি বাঁচাবেন তো ?

চিন্তিত ভাবে আমি বললাম : সবই তো তুমি বলে দিয়েছ।

না না সঞ্জয়বাবু, সব আমি বলি নি। বলি নি যে বিপিনবাবু জোর করে এই সব কথা লিখিয়েছেন, আর—

আর কী ?

আর নির্মলের বাক্স-বিছানার উপরের লেবেল আমি নিজে হাতে সেঁটে দিয়েছি। বিপিনবাবুর কথায় আমার নিজের লেবেল তুলে নিয়েছিলাম।

তারিখ ?

তারিখ লেখা আছে কিনা জানি নে, নিজের ক্ষতির কথা বুঝতে পেরে খানিকটা আমি ছিঁড়ে দিয়েছি।

পূর্বাপর সমস্ত ঘটনা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। নির্মল যে খুন করেছে তার কোন প্রমাণ নেই। খুনের কোন কারণও খুঁজে পাওয়া যায় নি। নির্মল ট্রেনে না এসে উড়োজাহাজে এসেছে প্রমাণ হলে খুনের সময় সে কলকাতায় ছিল সেইটুকুই মানতে হবে। নির্মলের আতঙ্কের কথা শুধু মায়া জানে। মায়ার জবানবন্দীর উপরই সব নির্ভর করবে। বললাম ঃ চাকরিতে ইস্তফা কেন দিলে ?

লোভের কবল থেকে মুক্তি পাবার জন্য। বিপিনবাবুরা আমাকে অনেক লোভ দেখাবে।

চাকরিতে বহাল থাকলে তোমার কথার দাম বেশি হত।

কিন্তু নির্মল আমাকে বিশ্বাস করত না। আমাকে সে অবিশ্বাস করলে আমার বেঁচে থাকার কোন সার্থকতা নেই। আমি এখন কী করব সঞ্জয়বাবু ?

নির্মলকে একটা সংবাদ দাও। তোমার কাছে যা বলেছে, সে কথা যেন আর কাউকে না বলে।

মায়ার দৃষ্টি তখন আনন্দে ছলছল করছে। বলল ঃ আর কিছু বলব না ?

ব'লো আমি তার ভাবনা ভাবব, সে ভাবুক তোমার কথা।

মায়া উঠে দাঁড়িয়েছিল। চোখের জল গোপন করতে সে তার মুখ ফিরিয়ে নিল। অদ্ভুত এক প্রসন্নতায় আমার মন তখন ভরে গেছে। বললাল ঃ চল, তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসি।

মায়াকে তার হোটেলে পৌঁছে দিয়ে ফেরার পথে আমি পৃথিবীর

অন্য রূপ দেখলাম। মেঘমুক্ত নির্মল আকাশের অগণিত তারা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। পথ অন্ধকার নয়। নক্ষত্রের আলোয় দেখা যাচ্ছে প্রশস্ত রাজপথ। কিন্তু এই কি জীবনের পথ? এই পথেই কি যাত্রা সার্থক হবে? আমি কি ভুল করলাম না?

ভুল নয়, এ তুমি ভালই করেছ।

নিঃশব্দ পদক্ষেপে কল্যাণী কখন আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল খেয়াল করি নি। মুগ্ধ বিস্ময়ে আমি তার মুখের দিকে তাকালাম।

কল্যাণী বলল: জীবনে আর মেঘ নেই, আর তোমাকে আদালতের আত্মকথা লিখতে হবে না। এবারে তুমি মানুষের কথা লিখতে পারবে।

সেই তো পরম কথা।

সমাপ্ত